মোক্ষদা

(উপন্যাস)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
১৩২৯

মূল্য ১৸০

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

&
SONS

প্রিণ্টার-শ্রীশাতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
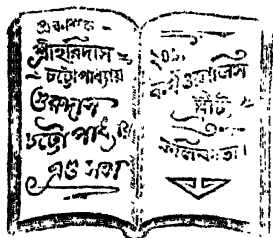
মোক্ষদা

আত্মকথা

বাঙ্গালার দরিদ্রলোক আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালার ধনী জমীদার কুলও ক্রমে ধনহীন হইয়া পড়িতেছেন। জমীদারগণের ধনহীনতার অনেক কারণ আছে; আমরা একটি মাত্র কারণ এই উপন্যাসে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই ধনহীনতা হইতে কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে তাহাও বড় ঠাকুরাণীর চরিত্রে বুঝাইয়াছি। রাণী ভবানীর দেশের লোককে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বদেশবাসীকে, রাণী শঙ্করী বা রাণী রাসমণির ভক্তগণকে বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে এই বাঙ্গালা দেশে, অনেক জমিদারগৃহিণীই, বড়বধূঠাকুরাণীর ন্যায়, জমিদারী রক্ষা করিতে, এবং উহার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থা। এই অন্তঃপুরচারিণীগণ কোথা হইতে এই শক্তিলাভ করেন, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

আশ্রম, হুগলি
১লা আশ্বিন, ১৩২৯

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মোক্ষদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাজপুরের জমীদারী।

আমরা তাজপুরের কায়স্থ জমীদারদিগের কথা বিবৃত করিব; তোমরা শ্রবণ কর।

দুইটি উপযুক্ত ও শিক্ষিত পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ জমীদার বাবু স্বর্গারোহণ করিলে, পুত্রগণ তাজপুর জমীদারীর পুরুষানুক্রমিক কীর্ত্তি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন; এবং পিতার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সত্ত্বাধিকারী হইলেন।

জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত করুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় জ্যেষ্ঠত্ব বশতঃ সমুদায় জমীদারী তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং জমীদারীর আয় হইতে সংসারিক ব্যয় সকল নির্ব্বাহ করিতেন। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অরুণ-চন্দ্র সিংহ মহাশয় আপন হাত খরচ জন্য জমীদারী তহবিল হইতে কেবল মাত্র মাসিক একশত টাকা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল।

ইদানিং কিন্তু, অরুণ বাবুর হাত খরচ জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন হইল। এবং করুণ বাবু উৎসবাদিতে ব্যয় সংক্ষেপ করায়, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে অরুণ বাবু জ্যেষ্ঠ করুণ বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। এবং অন্য হিতৈষী লোকের দ্বারা আপন মনোভিলাষ জ্যেষ্ঠের কর্ণগোচর করাইয়া জমীদারীর অর্দ্ধাংশ এবং অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধ অংশ পৃথক করিয়া লইলেন।

তাজপুর গ্রামে তাজপুরের জমীদারদিগের দুইটি বাটী ছিল। একটি নহবত শালা, দেবালিন্দ, চত্বর, অন্তঃপুর, অঙ্গন, খিড়কী প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত সুবৃহৎ বসতবাটী। অন্যটি বসতবাটীর অনতিদূরে উদ্যান মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী। ভদ্রাসন বাটীটি জমীদার বাটী বলিয়া তৎপ্রদেশে প্রখ্যাত ছিল। উদ্যান মধ্যস্থিত অন্য বাটীটিকে লোকে জমীদারদিগের বাগান বাটী বলিত।

জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত করুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ বশতঃ এবং কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ব্যবহারের ঔচিত্য অনুভব করিয়া সুবৃহৎ ভদ্রাসন বাটী দুইভাগে বিভক্ত না করিয়া, সমুদয় অবিভক্ত অংশ কনিষ্ঠকে প্রদান করিলেন; এবং আপনি উদ্যান সহ ক্ষুদ্র বাগানবাটীটি গ্রহণ করিলেন।

অরুণ বাবু বৃহৎ ভদ্রাসন বাটীর সমুদায় অংশ পাইয়া আপনাকে বিশেষ লাভবান মনে করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু একটি বাগানবাটীরও অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিলেন

এবং তখনই মনোমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, ঐ ক্ষুদ্র বাগান বাটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাগানবাটী তিনি অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ করুণ বাবু আর একটি সদাশয়তার কার্য্য করিয়াছিলেন।

জমীদার ভ্রাতাদিগের পিতা মৃত্যুকালে যথেষ্ট ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ করুণ বাবু চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কনিষ্ঠ অরুণচন্দ্র আপন অংশের সম্পত্তির আয় হইতে আপন ব্যয়ভার বহন করিলে, অতঃপর তিনি সহজেই আপন ব্যয় লাঘব করিতে পারিবেন; এবং আপন অংশের উদ্বৃত্ত আয় হইতেই সহজেই সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। ইহা মনে করিয়া, তিনি ঋণদাতাকে বলিয়া, পিতৃঋণের সমুদায় ভার আপন স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন; এবং এই ঋণের দায় হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিলেন। পিতৃঋণ হইতে সহজে মুক্তিলাভ করিয়া অরুণ বাবু ভাবিলেন যে, এক্ষণে উৎকৃষ্ট বাগান বাটী প্রস্তুত করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অনায়াসসাধ্য হইবে।

তাজপুরের জমিদারদিগের সমুদায় জমীদারীর আয় বাৎসরিক পনের হাজার টাকা ছিল। এক্ষণে সম্পত্তি বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেক ভ্রাতার বার্ষিক আয় হইল—সাড়ে সাত হাজার টাকা।

পিতৃঋণের পরিমাণ পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা; এবং ইহার বাৎসরিক সুদ তিন হাজার টাকা দিতে হইত। উভয় ভ্রাতা পৃথক হইবার পূর্ব্বে, করুণ বাবু দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবের

ব্যয় ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সংকুচিত করিতে পারেন নাই ; এজন্য এ যাবত সুদ ব্যতীত মূল ঋণের কিছুই পরিশোধ হয় নাই। এক্ষণে পৃথক হইয়া তিনি উৎসবাদির ব্যয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন ; এবং কর্ত্তব্যময়ী ও বুদ্ধিমতী পত্নীর সহায়তায় অন্যান্য সাংসরিক ব্যয়ও বহুল পরিমাণে সংযত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে, জমীদারী বিভাগের পর, প্রথম বৎসরেই তিনি সমুদায় সুদ পরিশোধ করিয়া, মূল ঋণের কিয়দংশ কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এবং আশা করিয়াছিলেন যে দশ পনের বৎসরের মধ্যে সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া, ক্ষুদ্র বাগানবাটীতে নূতন কক্ষ সকল সংযুক্ত করিয়া তাহার আয়তন, জমীদার পরিবারের বসবাসের উপযুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু মানুষ যাহা আশা করে, তাহা সফল করিবার ক্ষমতা ভগবান মানুষের হাতে প্রদান করেন নাই। বিষয় সম্পত্তির বিভাগের দেড় বৎসরের মধ্যেই সঙ্কটাপন্ন রোগে করুণ বাবু শয্যাশায়ী হইলেন। সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায়, পতিব্রতা পত্নীর প্রাণপণ সেবায়, শিশুপুত্রের কোমল হস্তের শীতল প্রলেপে সে রোগের উপশম হইল না। কয়েক দিন রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুর সহিত তাঁহার সকল আশা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণী ছয়বৎসরের এক শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জন্মের মত স্বামীহারা হইলেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়

পত্নীর সহিত দুই চারি দিন দাদার বাটীতে আসিয়া পারিবারিক শোক ক্রন্দনে যোগদান করিয়াছিলেন ; দাদার শ্রাদ্ধ কার্য্য কিরূপ ব্যয়ে সম্পন্ন করিলে তাজপুর জমীদারদিগের দেশপরিব্যাপ্ত সুনাম অব্যাহত থাকিবে, ভ্রাতৃজায়াকে তদ্বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিরূপে দাদার পরিত্যক্ত জমীদারী রক্ষা পাইবে, কি উপায়ে ভ্রাতৃজায়া স্বামীর ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিবে, কিরূপে দাদার শিশুপুত্রের বিদ্যাশিক্ষা সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সদুপদেশই খুঁজিয়া পান নাই।

যথাকালে মৃত করুণ বাবুর শ্রাদ্ধকার্য্য হইয়া গেল। কিন্তু নির্ব্বোধ ভ্রাতৃজায়া পূজনীয় স্বামীর শ্রাদ্ধে, অরুণ বাবুর সদুপদেশ মত দশহাজার টাকা ব্যয় না করিয়া কেবলমাত্র পাঁচ শত টাকা মাত্র ব্যয় করায়, জমীদার অরুণ বাবু শ্রাদ্ধ বাড়ীতে মুখ দেখাইতে পারেন নাই।—তাঁহার জ্যেষ্ঠের শ্রাদ্ধে পাঁচ শত টাকা ব্যয় !—ছি ! ছি ! তিনি জন-সমাজে মুখ দেখাইবেন কিরূপে ? কিরূপে তাঁহার দাদার বিবাহিতা বনিতা এত নীচ হইতে পারিল ; তাই তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না ; তিনি যাহাকে যাহাকে সেই অত্যাশ্চর্য্য কথা জানাইলেন, তাহারাও তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

কাশীধামের এক তপঃপ্রভ বহুশাস্ত্রজ্ঞ যতির নিকট করুণা বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী সহ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীহীনা হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া গৃহিণী গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। তিনি তাজপুরে আগমন করিয়া

পরলোকগত শিষ্যের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, কার্য্যতঃ সেইরূপই নিষ্পন্ন হইল।

গুরুদেব শিষ্যকে আরও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বদর্শী গুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বামীহীনা বড়বধূঠাকুরাণী আপন অংশের বাৎসরিক আয় সাড়ে সাত হাজার টাকা হইতে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার এবং গ্রাসাচ্ছাদনের সংক্ষিপ্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, স্বর্গগত শ্বশুরের ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবতী হইলেন। আমরা যথা কালে দেখিব, সদ্‌গুরুর পরামর্শে এবং নিজের ঐকান্তিক যত্নে তিনি কিরূপ সুফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

করুণ বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম কৃষ্ণকিশোর, আর অরুণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাধাকিশোর। দুই জনই সমবয়স্ক। বৃদ্ধ জমাদার বাবু দুই পৌত্রের কৃষ্ণরাধা নাম রাখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, পৌত্রদের নাম উচ্চারণ করিলেই ফাঁকিতে ভগবানের নাম লওয়ার মহাপুণ্য সঞ্চিত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণকিশোর পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর বাটীতে থাকিয়া মাতার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করিল। তাহার পর, অধিক বিদ্যালাভ জন্য কলিকাতায় যাইয়া, গ্রামের অন্য এক বালকের সহিত পটলডাঙ্গা অঞ্চলে এক ছাত্রবাসে বাস করিতে লাগিল। রাধাকিশোরও পাঠের উন্নতির জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়।

দ্বিতলে বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর। তাহার ছাদে বিচিত্র স্ফটিক ঝাড় সকল ঝুলিতেছিল, তাহার ভিত্তিগাত্রে বৃহদাকার চিত্র সকল লম্বিত ছিল, তাহার মেঝেতে শপের উপর সতরঞ্চ এবং সতরঞ্চের উপর জাজিম বিস্তৃত ছিল। সেখানে তাকিয়া, পানপাত্র, নানাপ্রকারের ধূমপান যন্ত্র এবং ফরমাইস শুনিবার জন্য একজন পরিচারক সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিত। সেখানে সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয়, এবং গ্রামস্থ অন্যান্য বিজ্ঞগণ সমবেত হইতেন। সেখানে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়, ছোটবাবু মহাশয় বলিয়া সম্বোধিত হইয়া কর্ণ-বিবরে মধুর সুখ উপভোগ করিতেন। সেখানে বিজ্ঞগণ যে বাক্য সুধা বর্ষণ করিতেন তাহা তিনি সত্য—অতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

একদিন এক বিজ্ঞব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন,—"দেখুন ছোটবাবু মশাই, এবার কিন্তু কলিকাতা থেকে, এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে একজন বিখ্যাত বাইজিকে আনতে হবে।"

উদারাত্মা ছোটবাবু মহাশয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, ইহা সত্য—অতি সত্য!—একজন মুসলমান বারবনিতা আসিয়া

অঙ্গভঙ্গিমা সহকারে পলাণ্ডু সুবাসিত শ্রীমুখে যদি প্রেমরাগিণীর লীলা না দেখাইল, তবে পবিত্র দেবীপূজা একবারে অঙ্গহীন হইয়া যাইবে।

পুরোহিত মহাশয় শব্দ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি বুঝাইয়া দিলেন, "আহা-হা! যখন 'উৎসব' কথাটার অর্থই নৃত্যগীত, তখন পূজায় নৃত্যগীতের প্রয়োজন আছে বই কি!"

তদবধি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পৈতৃক ভদ্রাসনে, দুর্গোৎসবের আসরে বাইনাচের ব্যবস্থা হইল। তাহা দেখিয়া, শতশত মুখ হইতে শ্রাবণের জলধারার ন্যায়, প্রসংশা ছোটবাবু মহাশয়ের উৎকর্ণ কর্ণে বর্ষিত হইতে লাগিল। শুনিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের কর্ণ জুড়াইয়া গেল।

আর একদিন অন্য এক প্রাজ্ঞব্যক্তি কহিলেন,—"ছোটবাবু মশাই, আপনার কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে। বড় বাবু বেঁচে না থাকায়, বিশেষতঃ ওবাড়ীর কর্ত্রী ঠাকুরুণের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব না থাকায়, ওখানে যখন দুর্গোৎসব হয় না, তখন এ বাড়ীর দুর্গোৎসবে বিসর্জ্জনের দিন কিছু আতস বাজী পোড়ান নিতান্ত আবশ্যক।"

ছোটবাবু মহাশয় বুঝিলেন যে, কথাটা সত্য—অতি সত্য! এবং বিজ্ঞজনোচিত বটে।—কারণ পূজ্যা দেবীকে বিদায় দিবার সময় যদি পটকা সকল সহস্র সহস্র করতালির ন্যায় পট্ পট্ শব্দ না করিল, যদি হাউই সকল বহ্নিময়ী নাগিনীর ন্যায় গগন পথে বিচরণ না করিল, তবে আর প্রতিমা বিসর্জ্জনের সুখ কি?

পঞ্জিকা-শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন,—"শাস্ত্রে যখন বল্‌ছে যে প্রদোষে বহ্ন্যুৎসব, তখন বাজি পোড়ানোর আবশ্যক আছে বই কি।"

কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইলে, ছোটবাবু মহাশয় ভাবিলেন যে রাধাকিশোরও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকেও কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। তখন গ্রামস্থ সুধীগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিলেন,—"দেখুন ছোটবাবু মশাই! আপনার ছেলেরা হল জমিদারের ছেলে, পাঁচ জনের সঙ্গে মেসের বাড়ীতে থাকা ওদের পোষাবে না; ওদের জন্যে একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া আর গাড়ী ঘোড়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।"

ছোটবাবু মহাশয় অনায়াসে বুঝিলেন যে, কথাটা সত্য—অতি সত্য!—কারণ কলিকাতায় বাড়ীভাড়া লওয়া হইলে, তিনি নিজে মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া অবস্থিতি করিতে পারিবেন; এবং গাড়ী চড়িয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতে পারিবেন।

পুরাণ-পারদর্শী পুরোহিত মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে পুরাণোল্লিখিত সকল রথীরই যখন রথ ছিল, আর যখন ছোটবাবু মহাশয়ের কুমারেরা দেবী ভারতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, তখন তাহাদেরও রথ অর্থাৎ গাড়ী থাকার প্রয়োজন আছে বই কি!

অতএব যখন সানুজ রাধাকিশোর পল্লীগ্রামের পাঠ সমাধা করিয়া কলিকাতায় গেল, তখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায়

একটী অনতিবৃহৎ বাটী ভাড়া লওয়া হইল; এবং অশ্বসহ একখানি অশ্বশকট ক্রয় করিয়া ঐ বাটীর আস্তাবলে রাখা হইল।

এইরূপে জ্যেষ্ঠের পিতৃহীন পুত্র কৃষ্ণকিশোর যখন কলিকাতায় সামান্য ছাত্রবাসে থাকিয়া পদব্রজে বিদ্যালয়ে যাইত, তখন শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়ের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীমান রাধাকিশোর কনিষ্ঠগণের সহিত তেজোদীপ্ত অশ্বসংযুক্ত রমণীয় গাড়ীতে চড়িয়া আপনাদিগের ভাড়াটীয়া বাটী হইতে বিদ্যামন্দিরের দিকে ধাবিত হইত।—এই অপূর্ব্ব ধাবন দেখিবার জন্য, আমাদের মনে হয়, স্বয়ং বিদ্যাদেবী স্বর্গীয় কৌচের উপর বীণাটী ফেলিয়া, আলু থালু বেশে অন্তরীক্ষের গবাক্ষপথে ছুটিয়া আসিতেন। এইরূপে যখন কৃষ্ণকিশোর পূজার অবকাশে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আপনাদের অপরিসর গৃহ ও মাতার চির-বিষাদময় মুখ অবলোকন করিত, তখন ছোটবাবু মহাশয়ের ভাগ্যবর বংশধরগণ কলকল কোলাহলপূর্ণ বিস্তীর্ণ অট্টালিকাতে আসিয়া, উৎসবালোকোজ্জ্বল আসরে বসিয়া বাইজীর অঙ্গ ভাঙ্গমা-ময় সঙ্গীতোচ্ছাস শ্রবণ করিত, এবং প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে তড়াগ-পার্শ্বস্থিত পল্লবপ্রসূন মণ্ডিত বিচিত্র উচ্চ মণ্ডপে বসিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বহু বাদ্যোদ্যম মধ্যে বিচিত্র অগ্নিক্রীড়া নিরীক্ষণ করিত, তৎকালে শ্রীমান রাধাকিশোরের পরম সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া পল্লীবাসী অন্য যুবকগণ মনে করিত, আহা! না জানি রাধাকিশোর পূর্ব্ব জন্মে কত তপস্যা

করিয়াছিল, যাহার ফলে ছোটবাবু মহাশয়ের ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ড-পরায়ণ অসাধারণ পিতা লাভ করিতে পারিয়াছে!

জ্যেষ্ঠের শ্রাদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে ভ্রাতৃজায়ার সহিত মতান্তর হইবার পর হইতে শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় ভ্রাতৃজায়া বা তৎপুত্রের সহিত সকল সংস্রবই ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুর্গোৎসবাদিতে তাঁহারা অন্যের ন্যায় পত্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হইতেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া, আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদের আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত না। পরন্তু কৃষ্ণকিশোরের মাতা অন্যান্যের ন্যায়, বারবনতার নৃত্য দেখিতে যাওয়া শ্লাঘার কথা মনে করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, ভগবান যে জাতিকে জননী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে আপনাদের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী পুরুষগণকে প্রদর্শন করায়; আর কিরূপেই বা সমাজপতি পুরুষগণ জগন্মাতার পূজার আসরে বসিয়া অবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে মাতৃজাতির এই ঘৃণ্য অধঃপতন চাহিয়া দেখে!

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় বড় বধুঠাকুরাণীর সহিত সকল সম্পর্কই ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিন্দা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেন জানি না, এই নিন্দায় তিনি একটা আনন্দ উপভোগ করিতেন। গ্রামস্থ যে সকল বিজ্ঞব্যক্তি তাহার বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইতেন, তাঁহারা তাঁহার জ্যেষ্ঠের বিধবা পত্নী সম্বন্ধে কোন একটা নিন্দা উত্থাপন করিলে তিনি হাস্যপ্রসন্ন মুখে সে নিন্দায় যোগদান করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, একজন সদরওয়ালার কন্যা হইয়া

এবং এইরূপ উদার ও প্রখ্যাত জমিদার কুলের প্রথমা কুলবধূ হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কিরূপ এরূপ নীচমনা হইতে পারিলেন; পদের উপর পদ সংস্থাপিত করিয়া যাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারই শ্রাদ্ধে যখন এক পয়সা খরচ করিতে পারিলেন না, তখন বড় বধূঠাকুরাণী অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সবই করিতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বড় বধূঠাকুরাণীর নিন্দা

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়ের বৈঠকখানায় বড়বধূঠাকুরাণীর কিরূপ নিন্দা হইত আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব।

একদিন কয়েকটি গ্রাম্য পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত হইয়া ছোটবাবু মহাশয় তারাদল মধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় বৈঠকখানা ঘরে বিরাজ করিতেছিলেন। এবং নিকটবর্ত্তী এক ভদ্রের নিকট হইতে আপন মুক্তহস্ততার ও উদারতার শ্রবণসুখকর যশোগান শ্রবণ করিতে করিতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান করিতেছিলেন। তখন অন্য একটি পরিচিত প্রিয় ব্যক্তি, আর একটি তাহার মত সভাক্ষেত্রে উদিত হইয়া কহিল,—"আর শুনেছেন, ছোটবাবু ?"

ছোটবাবু মহাশয় আপন কৌতুহলোদ্দীপ্ত আঁখি বিস্ফারিত করিলেন; এবং আলবোলার স্বর্ণময় মুখনলটি মুখ হইতে অপসারিত করিয়া কুণ্ডলীকৃত সুগন্ধ ধূমরাশি বায়ুমুখে ছাড়িয়া দিলেন। ধূম অল্প উর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুপথে বিলীন হইয়া গেল;—বুঝি পৃথিবীর লোককে বুঝাইয়া দিয়া গেল যে, মানব-মুখের যশোরাশি অমনই অসার—অমনই ক্ষণস্থায়ী সৌরভ বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া যায়। অতঃপর তিনি সুমিষ্ট নূতন সংবাদ শুনিবার প্রত্যাশায় হর্ষান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"কি হে, ও বাড়ীর বড়বৌঠাকৃরুণের কোন কথা নাকি ?"

সন্দেশবহ ভদ্র বিশেষ উল্লাস প্রদর্শন করিয়া কহিল,—"ছোট বাবু মশায় ঠিক অনুধাবন করেছেন। আপনার অনুধাবন শক্তি দেখে মনে হচ্চে যে পূর্ব্বজন্মে আপনি নিশ্চয় একজন বিশিষ্ট গণৎকার ছিলেন।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি ভাবিল যে, সে আজ যেমন তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে তাহাতে সমবেত সকলকেই তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইবে; অতএব সে সকলের মুখের দিকে বিজয়ীর ন্যায় গর্ব্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই তোষামদের কাছে সত্যই পরাভূত হইতে হয় এই আশঙ্কায় অন্য এক পার্শ্বচর কহিল,—"ওহে! আমাদের ছোট বাবু মশায় কেবল গতজন্মে গণৎকার ছিলেন না! উনি এ জন্মেও গণৎকার এবং পর জন্মে নিশ্চয়ই গণৎকার হবেন।"

পরজন্মে জমিদার না হইয়া গণৎকার হইবার আশায় বিশেষ সুখ অনুভব করিতে না পারিয়া ছোটবাবু মহাশয় একটু কষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু বড়বৌঠাকৃরুণের কি কথা বলছিলে ?"

পূর্ব্বোক্ত ভদ্র কহিল ;—"হাঃ হাঃ হাঃ! এমন হাসির কথা আপনি কখনও কোন জন্মে শোনেন নি, আমরাও শুনিনি।"

ছোট বাবু মহাশয় বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু কথাটা কি ?"

ভদ্র। আজ সাত বছর হ'ল বড় বাবু মারা গেছেন, এই সাত বছরের মধ্যে বাগানবাড়ীর বড়গিন্নীঠাকরুণ কোন কাপড়ওয়ালাকে একটি ছোট্ট কানাকড়িও দেন নি।

ছোটবাবু। কাপড়ওয়ালারা এত দিনের টাকা বাকী ফেলে রেখেছ কেন?

ভদ্র। বাকী থাকলে ত বাকী ফেলবে! কাপড়ওয়ালারা এই সাত বছরের মধ্যে ও বাড়ীতে একখানি গামছাও বিক্রি করতে পারেনি। আজ শুনলাম, বড়গিন্নীঠাকরুণ এই সাত বছর, এক পয়সারও কাপড় কেনেন নি।

ছোটবাবু। বল কি? তুমি যে আমাকে অবাক্ করে দিলে। কাপড় কেনেন না ত পরেন কি? মেয়েমানুষ, কাপড় নইলে ত চলবে না। তারপর ছেলেটা বড় হয়েছে; কলকাতায় পড়ছে, তার কাপড় জামা চাই।

ভদ্র। আপনার মত এত না থাক, কিন্তু বড়বাবুর কতকগুলো জামা কাপড় ছিল। তার মধ্যে দামী দামী শাল রুমাল গুলো বারশ' টাকায় বিক্রী করেছেন। আর কোট পিরাণ যা ছিল তা' ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে ছোট ক'রে ছেলেকে পরতে দিয়েছেন। আর কাপড় যা ছিল, তার পাড় ছিঁড়ে ফেলে নিজে পরেছেন।

ছোটবাবু। তাঁর নিজের যে সকল ভাল ভাল সাড়ী ছিল, সে গুলো কি করলেন।

ভদ্র। শুনলাম দামী রেশমী কাপড় গুলা বিক্রমপুরে দিয়ে আটশ' টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন। আর সূত কাপড় গুলো পাড়ার

ছোটলোকদের মেয়ে গুলোকে পরতে দিয়েছেন। তারা সেই কাপড় প'রে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ সেজে আপনার পূজার দালানে দুর্গোৎসবের সময় আরতি দেখ্তে আসে। তা' ছুঁড়ীগুলোকে মন্দ দেখায় না। হাঃ হাঃ হাঃ।"

ছোটবাবু ও অন্যান্য পার্শ্বচরগণও সেই হাসিতে যোগদান করিয়া হাসিতে লাগিলেন, —"হাঃ হাঃ হাঃ!"

দেবরের বৈঠকখানায় বড়বধূঠাকুরাণীর এই রূপ নিন্দা প্রায় প্রত্যহই কীর্ত্তিত হইত। বলাবাহুল্য, এই সকল নিন্দা ক্রমে বড়বধূঠাকুরাণীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। তিনি জানিতেন যে গ্রামের লোকে তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে; এবং যাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধ জন্য তিনি নানা অভাব সহ্য করিয়া সকল প্রকার ব্যয় সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তিনিও ঐ সকল নিন্দায় যোগদান করিয়া থাকেন। জানিয়াও তিনি ঐ সকল নিন্দায় বিচলিত হইতেন না। তিনি বাহ্যাড়ম্বর বিবর্জ্জিতা এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাহ্যাড়ম্বরের ক্ষণিক মোহ এবং তজ্জন্য অস্থায়ী যশঃপ্রাপ্তির লিপ্সা ত্যাগ করিতে না পারিলে, তিনি কখনও স্বর্গীয় শ্বশুরের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না; এবং পুত্রকেও সুশিক্ষিত করিবার সুবিধা পাইবেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লোকমুখে যে যশোগান উত্থিত হয় তাহা অবিলম্বে মণ্ডপের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায় পথের ধূলায় বিলীন হইয়া যায়; সেই আস্ফালন জলবুদ্বুদের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের মৃদু ফুৎকারে ফাটিয়া যায়।

তাঁহার গুরুদেবে একবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা, একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধারী পার্থ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে সখা, যথার্থ ভগবদ্ ভক্তকে আমি কিরূপে চিনব! অর্জ্জুনের প্রশ্ন শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ বলে দিয়েছিলেন। সেই লক্ষণগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান লক্ষণ কি জান?—

'তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী
সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'

অর্থাৎ নিন্দা ও স্তুতি যার পক্ষে সমান, যে মুখ বুজে কাজ করে, আর যে যাতে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, সেই আমার ভক্ত।

বড়বধূঠাকুরাণী গুরুর বা ভগবানের উপদেশ বাণী চিরদিন ভক্তিপূর্ব্বক আপন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন; এবং আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া মৌনভাবে অপরের নিন্দাস্তুতি শুনিয়া যাইতেন; কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বড়বধূঠাকুরাণীর অপকর্ম্ম।

স্বামীগতপ্রাণা বড়বধূঠাকুরাণী ছয়বৎসর বয়স্ক শিশু কৃষ্ণকিশোরকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীকে জন্মের মত হারাইয়াছিলেন। আজ সেই কৃষ্ণকিশোরের বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং প্রায় আট বৎসর কাল তিনি সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় আপনার বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই অসহায় অবস্থায় তিনি ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে এবং স্বর্গগত স্বামীর পবিত্র স্মৃতিতে হৃদয় পবিত্র করিয়া, কুটুম্ব-কুটম্বিনী ও পল্লিবাসিগণের নিন্দা স্তুতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি আপন করণীয় কর্ত্তব্যগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতেন।

এই রূপে তিনি পুত্রের সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করিয়া, অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাহার আয় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই-রূপে তিনি প্রজাগণের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিয়া, তাহাদিগকে পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পুত্রকে বিদ্যার্জ্জনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। এবং সর্ব্বোপরি, এইরূপে তিনি শ্বশুরের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়া-ছিলেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় বড়বধূঠাকুরাণীর সকল কার্য্যকেই অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কৃষ্ণকিশোরের মাতার প্রথম অপকর্ম্ম—শাড়ী, শাল রুমাল, গাত্রালঙ্কার বিক্রয় করা। কিন্তু এই অপকর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রথমেই ঋণের ভার অনেকটা লঘু করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এবং এইরূপে প্রথম বৎসরের শেষেই মূল ঋণের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিশোধ হওয়ায় সুদের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এবং বৎসরের পর বৎসর মূলঋণ আরও খর্ব্ব হওয়ায় সুদের পরিমাণ উত্তরোত্তর কমিয়া আসিয়াছিল, এবং অন্য দিকে মূলঋণ পরিশোধের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে, অষ্টম বৎসরের শেষে, তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ সমুদয় পরিশোধ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকিশোরের মাতা আরও দুইটি অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমরা পরে পরে তাহা বিবৃত করিব।

তাজপুরের জমীদারদিগের পঞ্চাশ বিঘা ধানের জমী ছিল। সমুদয় সম্পত্তির সহিত এই ধান্য ক্ষেত্র সকল বিভক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণকিশোরের অংশে পঁচিশ বিঘা ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণকিশোরের মাতা আপন অংশের ধান্য ক্ষেত্র সকল ভাগে বিলি করিয়াছিলেন। ইহাতে বিনা খরচে তিনি প্রতিবৎসর একশত মণেরও অধিক ধান পাইতেন।

খাজানা আদায় জন্য, দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় জন্য এবং আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য একজন গোমস্তা, একজন সরকার ও দুইজন

পাইক নিযুক্ত ছিল; ইহারা আপন আপন বাটীতে আহার করিত। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকিশোরের মাতার সংসারে দুইটি পরিচারিকা এবং একজন পরিচারক ছিল; পাচিকা বা পাচক মোটেই ছিল না। কৃষ্ণকিশোরের মাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আপন সন্তানকে এবং আপন সন্তানতুল্য পরিচারক ও পরিচারিকা-গণকে আহার করাইতেন। ইহাতে তিনি যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন, পাচিকা নিযুক্ত থাকিলে, বোধ হয়, তেমন পরিতৃপ্তা হইতেন না। সদরওয়ালার কন্যা এবং জমীদারের কুলবধূ হইলেও, তিনি বারমাস অগ্নি তাপে থাকিয়া পাপ রন্ধন নামক অপকর্ম্মটা নিজেই সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে মোট পাঁচটি লোক আহার করিত; একজন্য ধান্যক্ষেত্র হইতে তিনি বৎসরে যে একশত মণ ধান্য পাইতেন, তাহার এক তৃতীয়াংশও ব্যয় হইত না; বেশী পরিমাণ ধানই সঞ্চিত থাকিত। এইরূপে আট বৎসরের শেষে প্রায় পাঁচ শত মন ধান্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকিশোরে মাতা গোমস্তা, সরকার প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা প্রাজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। একবার গোমস্তা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল,—'মা, এবার গ্রামের গৃহস্থ লোক খেতে না পেয়ে মারা যাবে। ধানের বাজার একবারে আগুন হয়ে উঠেছে—একমন ধানের দাম পাঁচ টাকারও বেশী হয়েছে।'

শুনিয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতা কহিলেন,—"আমার প্রজারা প্রতিমন ধান চারটাকা হিসাবে কিনতে পাবে। আমাদের গোলায় যে ধান আছে, তা তুমি চারটাকা মণ হিসাবে আমার

প্রজাদের বিক্রী করবে। কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে; দেখো, কেউ যেন ব্যবসা করবার জন্তে এই ধান না কেনে, কেবল যাদের সংসার নিতান্ত অচল হয়েছে, তারাই ঐ ধান পাবে।"

সঞ্চিত ধান্য বিক্রয় হইল। প্রজারা সন্তুষ্ট হইল। জমীদারী তহবিলে দুই সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইল।

যে বৎসর ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্য বিক্রীত হইয়াছিল, সেই বৎসর আশ্বিন মাস হইতে আর বৃষ্টিপাত হইল না। চৈত্রমাসের প্রখর রৌদ্রে আমাদের বঙ্গমাতার শ্যাম মেদুর মূর্ত্তি ম্লান হইয়া গেল; আকাশ যেন ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিবর্ষী-নেত্রে চাহিয়া রহিল; ক্ষেত্র সকল ফাটিয়া গেল,—পাতাল যেন পিপাসিত হইয়া, সহস্রমুখ ব্যাদান করিয়া পানীয়ের প্রত্যাশায় স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিল। গোমস্তা আসিয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতাকে সংবাদ দিল,—"মা, এবার সাপুরের প্রজারা জলের অভাবে মারা পড়বে। গ্রামে প্রায় চারশ' ঘর প্রজার বাস; কিন্তু তাদের খাবার মত জল এক বিন্দুও নেই।"

তাজপুর জমীদারীর যে অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণকিশোর পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে সাপুর গ্রামই প্রধান মহল। এই মহল হইতে বৎসরে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা তহসিল হইত; এবং সদর মালগুজারি বাদে এই মহলের বাৎসরিক আয় চারি হাজার টাকারও অধিক ছিল। এই গ্রামের মধ্যভাগে খুব বড় একটা দীঘি ছিল; এই দীঘিতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটিত, এজন্য ইহাকে লোকে

পদ্মপুকুর বলিত। তাজপুরের জমীদার বাটীতে যখন দুর্গোৎসব হইত, তখন দেবীর পূজার জন্য এই দীর্ঘিকা হইতে শত শত শতদল সংগৃহীত হইত। কৃষ্ণকিশোরের মাতা এ সকল বিষয়ই অবগত ছিলেন। তিনি গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? আমি ত শুনেছিলাম যে সাপুরে পদ্মপুকুর বলে একটা বড় দীঘি আছে।"

গোমস্তা বলিল,—"সে দীঘির জলও এবার শুকিয়ে গেছে, কেবল মাঝখানে একটু কাদার গোলা জল আছে। গ্রামের অপর সব পুকুর ডোবা শুকিয়ে গেছে।"

শুনিয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতার কণ্ঠ যেন ঐ জলশূন্য পুকুরের তলার মতই শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন,— ধান বিক্রি বাবত আমাদের হাতে দু'হাজার টাকা মজুত আছে, ঐ টাকা থেকে পদ্মপুকুরটা ভাল করে কাটিয়ে দাও; আরও গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তিন চারটা কুয়ো কাটিয়ে দাও। দু' একদিনের মধ্যেই যাতে কাজটা আরম্ভ হয় তার বিশেষ চেষ্টা কর।

পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইল; তাহাতে আবার ভূগর্ভস্থিত স্বচ্ছ, শীতল জল সঞ্চারিত হইল। কূপ সকলও খনন করা হইল। গ্রামবাসীর জলকষ্ট নিবারিত হইল; নির্ম্মল কূপের জলপানে তৃষ্ণার্ত্তের বিশুষ্ক কণ্ঠ সরস হইল। সেই সরস কণ্ঠে পল্লিবাসিগণ আপনাদিগের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সমস্ত আশীর্ব্বাদ তাহাদের কৃপাময়ী কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে প্রদান করিল। কেবল মুখের আশীর্ব্বাদ

নহে ; তাহারা স্বেচ্ছায় টাকা প্রতি দুই পয়সা জলকর দিতে স্বীকৃত হইল। ইহাতে মহলের আয় বৎসরে দুই শত টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

বলাবাহুল্য, শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় পার্শ্বচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপরিউক্ত দুইটি সংবাদই শ্রবণ করিলেন। ধান্য বিক্রয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"বড় বৌ ঠাকরুণ শেষে ধানওয়ালী হলেন।" পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"ওহে, বুঝেছ? এই সাপুরের পদ্মপুকুরটা নূতন করে কাটানর একটা মৎলব আছে। জান ত আমাদের দুর্গোৎসবের সময় ঐ পুকুর থেকেই পদ্ম আসত। ওঁর মহলের পুকুর থেকে আমার পূজোর পদ্ম আস্‌বে এটা বড় বৌ ঠাকরুণ সহ্য করতে পারলেন না। একবারে পদ্মগাছের গোড়া শুদ্ধ খুঁড়ে তুলে ফেলে দিয়েছেন। উঃ কি হিংসা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাতা ও পুত্র।

কৃষ্ণকিশোর পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোরের মাতা পুত্রের জন্য যত্ন পূর্ব্বক নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকিশোর তাহা আহার করিতে করিতে কহিল,—"মা, তোমার রান্নাটা কি মিষ্টি! আমাদের মেসের বামুনটা পনের টাকা মাইনে নেয়, কিন্তু সেও তোমার মত এমন ভাল রান্না রাঁধতে পারে না।"

মাতা হৃদয়ানন্দে আপ্লুত হইয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তাহ'লে আমার কত টাকা মাইনে হওয়া উচিত বল দেখি, কেষ্ট?"

কৃষ্ণকিশোর কিছু বিব্রত হইয়া কহিল,—"আচ্ছা দাঁড়াও, মা, আগে আমি একটা হিসাব করে দেখি। এই ধর, মেসের বামুনঠাকুর রাঁধে দুটো তরকারী, একটা ভাজা, একটা মাছের ঝোল, আর একটা অম্বল, আর তা ছাড়া কোন কোন দিন আলু ভাতে কি বেগুন পোড়া হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে মোটের উপর সে আমাকে সাত রকম জিনিষ খেতে দেয়। এখন তুমি কত রকম জিনিষ রেঁধেছ, তা একবার গুণে দেখি। এই ধর, প্রথমে এই এটা হ'ল, কলমী শাক ভাজা, তারপর হ'ল কচুশাকের ঘণ্ট,

তারপর হ'ল বরবটির ডালনা, তারপর হ'ল ইলিশমাছের তেলের ছেঁচ্‌ড়া, তারপর করলা মাছের ঝাল—এটা কি চমৎকার খেতে হ'য়েছে, মা,—তারপর পল্‌তার বড়া ভাজা, তারপর বড়ি ভাজা, তারপর এই আম্‌সির চাটনি; আর এদিকে এই সব বাটিতে, এটা হল নূতন মূলোর সুক্তানি, তারপর এই ছোট বাটীতে অড়হড় দাল, তারপর মাগুর মাছের ঝোল, তারপর কলায়ের দাল, তারপর চিংড়িমাছের অম্বল, তারপর এই সাদা পাথর বাটীতে দই ইলিশ। এই মোটের উপর চৌদ্দ রকম হ'ল। বামুন ঠাকুর রাঁধে সাত রকম, আর তুমি রাধ চৌদ্দ রকম। তাহ'লে তোমার মাইনে একবারে ডবল হওয়া উচিত।"

মাতা হাসিলেন; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহ'লে, কেষ্ট তোর মতে আমার মাইনে ত্রিশ টাকা হওয়া উচিত?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"কিন্তু তুমি যে, মা, বামুন ঠাকুরের চেয়ে দশগুণ ভাল রাধ?"

মাতা পুত্রের অনিন্দ্য মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন,—"তাহ'লে তুই বলছিস্ আমার উপযুক্ত মাইনে মাসে তিনশ' টাকা। কেমন?"

কৃষ্ণকিশোর মাতার রন্ধনের মাসিক মূল্য তিন শত টাকা ধার্য্য হওয়াতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে কহিল,—"কিন্তু, মা, তুমি যে আমাকে একশ' গুণ যত্ন ক'রে খাওয়াও?"

পুত্রের বাক্যে মাতার অঙ্গে অঙ্গে স্নেহের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মহানন্দে 'স্নেহময়ী' হৃদয় যেন নন্দনে পরিণত হইল।

তাঁহার প্রফুল্ল নয়ন হইতে স্নেহের নির্ম্মল ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই নির্ম্মল পবিত্র ধারায় পুত্রকে স্নাত করিয়া কহিলেন, —"তাহ'লে যে আমার মাইনেটা একবারে ত্রিশ হাজার টাকা হ'য়ে যায়, কেষ্ট। তুই কি আমাকে অত টাকা মাইনে কখনও দিতে পারবি ?"

কৃষ্ণকিশোর সভয়ে কহিল,—"তাত কখন দিতে পারবো না, মা।"

নবীনা নবপ্রসূতির পয়োধরে ক্ষীরোচ্ছাসের ন্যায় মাতার স্নেহ-রাশি উছলিয়া পড়িল। মাতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "তা আমাকে কখন দিতে হ'বে না, কেষ্ট। তুই শুধু আমাকে মা ব'লে ডাকিস্; আর আমার মরণের সময় আমার মুখে একটু গঙ্গাজল দিস্। তার দাম ত্রিশ কোটী টাকারও বেশী, কুবেরের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বেশী! সেই আমার স্বর্গ; তার বেশী আর কিছু চাইনে।"

মাতার শেষ অভিলাষের কথা শুনিয়া কৃষ্ণকিশোরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে কিয়ৎকাল কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর দুগ্ধ পান জন্য মাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কহিল, "মা, এখন আর আমি দুধ খেতে পারব না; পেট বড় ভরে গেছে। তুমি দুধটা রেখে দাও, আমি বিকালে জল খাবারের সময় খাব।"

মাতা পুত্রের দুগ্ধের বাটীটি ঢাকা দিয়া গরম জলে বসাইয়া রাখিলেন। কিন্তু দুগ্ধটা অপরাহ্নে পুত্রকে খাইতে দিতে পারিলেন না।

পল্লীপ্রতিবেশিনীগণ পূজা ব্রত প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে ছোটবাবুমহাশয়ের নিকট অন্তঃপুরমধ্যে সমাগত হইত বটে, কিন্তু কোন সাংসারিক দ্রব্যের অভাব হইলে তাহারা বাগান-বাটীতে বড়বধূঠাকুরাণীর নিকট আসিত। সম্প্রতি, এক প্রতি-বেশিনীর শিশু-পুত্রের পীড়া হইয়াছিল। চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন যে পীড়িত শিশু সদ্যসমাহৃত নির্জ্জল দুগ্ধের সহিত কোনও ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তাহাই পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে ; ঐরূপ দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পথ্য পাইবে না। শিশুর জননী গ্রামমধ্যে লোক পাঠাইয়া এবং দ্বিগুণ মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াও কোন স্থানে নির্জ্জল দুগ্ধ ক্রয় করিতে পারিলেন না। যে সকল গ্রামবাসী গৃহস্থের গাভী ছিল, তাহারা কেহই অসময়ে মাঠ হইতে গাভী আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া দোহাল ডাকিয়া, গাভী দোহন করিতে স্বীকৃত হইল না।—যে পবিত্র খাদ্যদ্রব্যে পল্লিশিশুর প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে, কি পরিতাপ! পল্লিগ্রামেও তাহা আর পাইবার উপায় নাই। অবশেষে শিশুজননী বড়বধূঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে এসময় কৃষ্ণকিশোর বাটী আসিয়াছে, সে দুগ্ধপান করিতে ভালবাসে ; তাহার জন্য, বড়বধূঠাকুরাণী নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। পরন্তু তিনি শিশুদিগের প্রতি, বিশেষতঃ পীড়িত শিশুদিগের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহময়ী। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্যই দুগ্ধ পাওয়া যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পল্লীবাসিনী শিশুজননী কৃষ্ণকিশোরের

মাতার নিকট আসিয়া পীড়িত পুত্রের জন্য দুগ্ধ প্রার্থনা করিলেন।

পরদুঃখকাতরার হৃদয়, ভগবানের শয্যাতলস্থিত তরঙ্গিত ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকিশোরের কথা তিনি একবারে ভুলিয়া গেলেন। বিকালে খাইবার জন্য সে যে দুগ্ধ রাখিয়া দিতে বলিয়াছিল, তিনি তাহা অবিলম্বে অম্লান বদনে শিশুজননীকে আনিয়া দিলেন।

হৃষ্টা পল্লিবাসিনী কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া, বাটীতে ফিরিয়া আপন পীড়িত পুত্রের ক্ষুন্নিবারণ করিলেন; এবং স্বর্গের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রতিবেশিনী প্রস্থিতা হইলে, কৃষ্ণকিশোরের মাতা, গ্রামমধ্যে দুগ্ধাভাব সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই? ভাবিলেন, তাঁহারা তাজপুরের জমীদার, তাজপুরের প্রজারা পীড়িত শিশুর জন্য অধিক মূল্য দিয়াও দুগ্ধ ক্রয় করিতে পায় না, ইহার প্রতীকার কে করিবে? দুগ্ধের অভাবে যদি প্রজাদের একটি শিশুরও প্রাণহানি হয়, তবে সে শিশুহত্যার জন্য দায়ী কে? দয়াময়ের ক্ষমার অক্ষয় ভাণ্ডারে এই শিশুহত্যার জন্য কি এতটুকু ক্ষমা আছে? এই গ্রামবাসীরা তাহাদেরই প্রজা, তাহাদেরই আশ্রিত। তাহারা অপর গ্রামে যাইয়া, 'আমরা তাজপুরের লোক' [illegible] একটা গর্ব্ব অনুভব

করিয়া থাকে; তাহাদের শিশু, তাজপুরের শিশু খাদ্যাভাবে মারা পড়িবে, আর তাজপুরের জমীদার নীরবে বিশুষ্ক নেত্রে তাহা অবলোকন করিবে? না, ইহা হইতে পারে না। জমীদার আশ্রিত-প্রজাকে অবশ্যই রক্ষা করিবে; যাহাতে প্রজারা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মারা না পড়ে, তাহার প্রতিবিধান জমীদারকেই করিতে হইবে। গ্রামবাসীরা যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে অবিকৃত দুগ্ধ গ্রামমধ্যেই ক্রয় করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করা জমীদারেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অতএব কর্ত্তব্যময়ী বড়বধূঠাকুরাণী সেই দিন সংকল্প করিলেন যে, গ্রামবাসিগণ শিশু ও পীড়িতগণের জন্য যাহাতে স্বল্প মূল্যে অকৃত্রিম গো-দুগ্ধ গ্রামমধ্যেই সর্ব্বদা ক্রয় করিতে পায়, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এ বিষয়ে কয়েকদিন ধরিয়া তিনি পুত্রের সহিত পরামর্শ করিলেন।

তাহার পর একদিন গোমস্তা ও সরকারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন,—"তোমরা গ্রামে আর কাছাকাছি গাঁয়ে সন্ধান করে রাখ; আমি চার পাঁচ মাসের মধ্যেই কতকগুলি দুধওয়ালা গাই কিন্‌তে চাই। কোথায় কি দরে, কি রকম গাই কিনতে পাওয়া যাবে, আমাকে তার খবর দেবে।"

সেইদিন হইতেই গোমস্তা ও সরকার ক্রয়যোগ্য পয়স্বিনী গাভীর অনুসন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কৃষ্ণকিশোর পূজা বা গ্রীষ্মাবকাশে বাটী আসিলে, মাতা তাঁহাকে কেবল মাত্র দু[illegible]পক ব্যঞ্জনই আহার করাইতেন

না, ইদানীং তিনি তাহাকে জমীদারী ও গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কার্য্যেও নিযুক্ত করিতেন। ফলতঃ কৃষ্ণকিশোর বাটী আসিয়া একটি দিনও অলস ভাবে কাটাইবার অবসর পাইত না। কোনদিন মহলে যাইয়া প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিত। কোনও দিন জমীর সীমানা বা অধিকার লইয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, মাতার আদেশে সে তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। এবার মাতা তাহাকে দুই একদিন কাট চূণ ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য নগরে পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে অবকাশের অবসান হইলে, কৃষ্ণকিশোর মাতার আশীর্ব্বাদে মস্তক মণ্ডিত করিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ময়ূর নাচিল।

তাজপুর গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে জমীদারদিগের এক বৃহৎ আম্রকানন। এই বৃহৎ আম্রকানন অন্যূন একশত বিঘা জমীর উপর বিস্তৃত ছিল। সম্পত্তি বিভাগের সময় কনিষ্ঠ জমীদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বাগানের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের পৈতৃক বাগান বাটীটি জ্যেষ্ঠ করুণ বাবু আপন বাসের জন্য গ্রহণ করায় ছোট বাবু মহাশয় একটি বাগান বাটীর অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পক্ষে এই অভাব অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর, তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পার্শ্বচরগণ একবাক্যে বুঝাইয়া দিল যে, যখন কলিকাতার সকল নামাজাদা বড়লোকেরই এক একটা বাগানবাড়ী আছে, তখন তাঁহার মত একজন ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদক, দেশবিখ্যাত জমীদারের পক্ষে একটা সুদৃশ্য বাগানবাটী না থাকা একটা দুরপনেয় কলঙ্ক। সেই সময় ছোট বাবু মহাশয়ের মহলে একটা বালির খনি দুই হাজার টাকা সেলামীতে বিলি হওয়ায় তাঁহার হস্তে কিছু নগদ মুদ্রা মজুদ ছিল; অতএব তিনি সহজেই বুঝিলেন, যে, এই কলঙ্কের কালী[illegible] বিদূরিত করা একান্ত আবশ্যক।

বুঝিয়া, তিনি আপন অংশের পঞ্চাশ বিঘা আম্রকানন প্রাচীর পরিবেষ্টিত করিয়া লইলেন; এবং আম্রবৃক্ষ সকল উচ্ছেদ করিয়া, সরোবর খনন করাইয়া, সরোবর তীরে সুন্দর বাগানবাটী প্রস্তুত করাইলেন।

এই বাগানবাটী রক্ষা করিবার জন্য একজন পশ্চিমদেশীয় দ্বারবান, এবং সুদৃশ্য পুষ্পবাটিকা সকল প্রস্তুত করিবার জন্য ও তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার জন্য দুই জন উড়িষ্যাদেশীয় মালী নিযুক্ত হইল। দ্বারবান বারান্দায় খাটিয়া পাতিয়া তাহাতে শয়ন করিয়া বাটী রক্ষা করিত। মালীদ্বয়ের চেষ্টায় কুসুম কানন মধ্যে যুবতীজনের কলহাস্যের ন্যায় মল্লিকা সকল ফুটিয়া উঠিল; ইরাণী রমণীগণের কপোলের ন্যায় বিকচ গোলাপ সকল যেন কাহার চুম্বন প্রাপ্তির লালসায় বিকশিত হইয়া রহিল; চম্পক পীতল রৌদ্রবর্ণ আভা অঙ্গে মাখিয়া দিগ্বিদিকে সৌরভ ছড়াইল; শেফালিকা বা ক্রোটন বৃক্ষের পরিবেষ্টনীর মধ্যে গাভীগণের বাঞ্ছিত দুর্ব্বাক্ষেত্র সকল গাভীগণকে বঞ্চিত করিয়া, জমীদার বাবুর পার্শ্বচরগণের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হইল। দেখিয়া ছোট বাবু মহাশয় ধন্য হইলেন।

বাটীতে কোনও প্রকার উৎসবাদি না থাকিলে ছোট বাবু মহাশয় প্রায় প্রত্যহ দিবাবসান কালে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া এই সরোবর শোভিত পুষ্পিত বাগান বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন।

কোনও সঙ্গী বিহ্বলনেত্রে সরোবর সলিল নিরীক্ষণ করিয়া কহিত, "আহা! এই পরমা পুষ্করিণী [illegible] কাকচক্ষু-পরাভবকারী

পরিষ্কার জলে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই এমন ভয়ানক পুণ্যলাভ হইবে, যে গোমুখীতে সহস্রবার গঙ্গাবগাহন করিলেও তেমন পুণ্য-লাভ হইবে না।

মহাত্মা ছোট বাবু মহাশয় সুধামুখ প্রিয়-সঙ্গীর পুণ্যলাভে বাধা প্রদান করিতেন না; পরন্তু সাবান, সুগন্ধী তৈল, তোয়ালে, স্নান-বস্ত্র ইত্যাদি স্নানোপকরণ আনাইয়া দিতেন। এ সকল দ্রব্য প্রিয়-সঙ্গীদের প্রীত্যর্থ সর্ব্বদা বাগান বাটীতে সংগৃহীত থাকিত।

কোনও সঙ্গী তাম্বুলরাগরক্ত সৃক্কণি লেহন করিয়া কহিত, আহা! এই মোহন সরোবরের স্বচ্ছ সলিল মধ্যে সুবর্ণ বিগঠিত পুচ্ছ নাড়িয়া যে সকল মৎস্য বিচরণ করে, তাহাদের দেহ শচীর অধর সুধা অপেক্ষা সুস্বাদু। আর ঐ অমৃতময় মৎস্য সকল এমন সুবোধ যে ছিপ্ ফেলিয়া আহ্বান করিবা মাত্র, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া টোপ গলাধঃকরণ করে।

পার্শ্বচরের এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া ছোট বাবু মহাশয় প্রীতি-বিকসিত হাস্য আননে বাগান বাটির বারান্দা হইতে ছিপ্ প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম আনাইয়া দিতেন; টোপের জন্য, তাঁহার আদেশ পাইয়া মালী মাটি হইতে মহীলতা তুলিয়া দিত। সৎসঙ্গী বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আপন বাটিতে লইয়া যাইত, এবং উহা রন্ধন জন্য গৃহিণীর করকমলে উপহার দিয়া, তাম্বুলসহ তামাকুর ধূমপান করিতে করিতে শচীর অধরসুধা পানের স্বপ্ন দেখিত।

কোনও সঙ্গী বসোরা দেশীয় কোনও গোলাপের প্রস্ফুটিত শোভা দেখিয়া কহি[illegible] মানস সরোবরের স্ফটিকসদৃশ-

সলিলোদ্ভব :যে বৃহৎ শতদল ইন্দ্রাণী আপন কৃষ্ণ কবরীতে ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার বিকচ শোভাও এই গোলাপের তুল্য নহে ; আর উহার সৌরভ নন্দনজাত পারিজাতের সৌরভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

শুনিয়া বদান্য জমীদার বাবুর আনন আবার হাস্যভঙ্গিমায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিত। তিনি তৎক্ষণাৎ রেশমী পাঞ্জাবীর পকেট হইতে সুদৃশ্য ছুরিখানি বাহির করিয়া দুইটী পত্রসহ গোলাপটি আহরণ করিতেন ; এবং বন্ধুর হস্তে উহা সমর্পণ করিয়া মনে করিতেন যে, বুনিয়াদি জমিদারগণের এইরূপ কার্য্যই করণীয় এবং শোভনীয়।

সঙ্গী পুষ্পলাভে তৃপ্ত হইত ; এবং বাটী ফিরিয়া, উহা তৃতীয় পক্ষের প্রিয়তমার কুণ্ডলীকৃত বেণীতে নিবদ্ধ করিয়া গদগদ চিত্তে ভাবিত, আহা! প্রিয়তমা বুঝি মানবত্ব অতিক্রম করিয়া অপ্সরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুষ্পবাটিকার শোভা আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য, কোনও সঙ্গী ছোটবাবুর মহাশয়ের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনুরোধ করিল যে, দুই বা ততোধিক ময়ূর দম্পতীকে বাগানমধ্যে প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক ; তাহারা পুচ্ছ বিস্তার করিয়া বিচিত্র সচল পুষ্প-বৃক্ষের ন্যায়, বাগান মধ্যে বিচরণ করিলে, বাগানের কমনীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

জমীদারবাবু সমজদার ব্যক্তি। তিনি প্রস্তাবটা প্রস্তাবিত

হইবামাত্র বুঝিলেন যে, হাঁ, দুই একযোড়া শিখি-দম্পতির শুভাগমন না হইলে, বাগানটা মোটেই মানাইবে না; বাগান প্রস্তুত জন্য, এবং উহাকে শোভাময় করিবার জন্য যখন এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তখন ময়ূর ক্রয় জন্য সামান্য আরও কিছু ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না; তাহা উদার হৃদয় জমিদারের উদারতার উপযুক্ত হইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ অর্থের সহিত কলিকাতায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা টিরেট্টা বাজার হইতে উচ্চমূল্যে উৎকৃষ্ট ময়ূর ক্রয় করিয়া আনিল। ময়ুরীযুবতীর প্রাণপতিগণ, বিবাহের আসরে কিংখাপের আঙরাখা-পরিহিত বরের ন্যায়, পুষ্পদলমধ্যে বিচিত্র পক্ষ বিস্তার করিল; কখনও ময়ূরীগণের সহিত পরমানন্দে নৃত্য করিল।

সেই শোভা, সেই নৃত্য দেখিয়া, শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় মনে করিলেন যে, স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভিনিনাদদ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার জয় ঘোষণা করিবেন; এবং বংশাবতংসের সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া, স্বর্গস্থ পূর্ব্বপুরুষগণ ধন্য হইবেন।—কি আনন্দ! কি আনন্দ!

কবি বলিয়াছেন, সুখ এবং দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা জানি, ছোটবাবু মহাশয়ের বৈকালিক আনন্দ অনেক দিন রাত্রে বিষণ্ণতায় পরিণত হইত। দিবাবসান কালে বাগান বাটীতে পরমানন্দে সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি বাটীতে আসিয়া বিষণ্ণ ও অনিদ্র রজনী যাপন করিবার জন্য শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

কোমল ও অমল শয্যায় পতিপদরতা ভার্য্যার পার্শ্বে শুইয়া তিনি ভাবিতেন, দেশের লোক, দেশের শাসক সম্প্রদায়, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং স্বয়ং বিধাতা সকলেই তাঁহার প্রতি বিমুখ।

যদিও তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই মূল্যাধিক্য বশতঃ, এবং তাঁহার জমীদারী তহবিলের চির অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন তিনি ক্রয় করিতে পারিতেন না, তথাপি তিনি সামান্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহা দেশের প্রায় কোনও লোকেই বাকীমূল্যে দিতে চাহিত না। তিনি দৈবাৎ দুই একটা সামগ্রী যদি বাকীমূল্যে ক্রয় করিতেন, তবে তাহার জন্যও দুর্ব্বিসহ তাগাদা সহ্য করিতে হইত। দেশের লোক তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিমুখ না হইলে, কখনই তাঁহাকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

বংশধরের হৃদয়ের উদারতার পরিমাণ বুঝিয়া, জমীদারীর আয় সপ্তগুণ বৃদ্ধি করা পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁহারা এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই। অতএব তাঁহার প্রতি তাঁহারাও বিমুখ।

প্রজাসত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া জমীদারগণকে খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা গভর্ণমেন্টের উচিত ছিল। তাঁহার এইরূপ অধিকার থাকিলে; তিনি প্রজাদিগের খাজনা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার বাৎসরিক

যটা অনায়াসে ত্রিশ সহস্র মুদ্রায় পরিণত করিতে পারিতেন; এবং তদ্দ্বারা বাগানের শোভা আকাঙ্ক্ষানুরূপ বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কি পরিতাপ! তাঁহার নির্ব্বোধ পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছিলেন, দেশের শাসক সম্প্রদায়ও তেমনই অবিবেচকের ন্যায় আইনের সঙ্কলন দ্বারা দেশের জমীদারগণের প্রতাপান্বিত বাহু, পক্ষাঘাতের রোগীর বাহুর ন্যায় একবারে অসাড় করিয়া দিয়াছেন।

তাহার উপর, বিমূঢ় বিধাতাও তাঁহার প্রতি অন্যায় প্রতিকূলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় যে কত সামান্য লোক, সামান্য নখদ্বারা সামান্য একটু মৃত্তিকা খনন করিতে না করিতে, কত সুবর্ণ-মুদ্রাপূর্ণ কত স্বর্ণ কলস প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর তিনি তেমন কীর্ত্তিমান ও ক্রিয়াবান জমীদার হইয়া, তেমন একটা সুগভীর সরোবর খনন করিয়াও, দুষ্ট বিধাতার কৌশলে আধখানি মোহরও প্রাপ্ত হইলেন না! অধিক কি, রাত্রে নিদ্রিত হইয়াও স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন না যে, আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতের কোন নিভৃত প্রদেশে, অপক্ক হরিদ্রার চাকৃতির ন্যায়, ক্ষুদ্রাকার বালসূর্য্যের ন্যায়, মোহর সকল প্রোথিত আছে।

এইরূপে দেশের লোকের আচরণে, পূর্ব্বপুরুষগণের অবিমৃষ্যকারিতায়, দেশের শাসকগণের পক্ষপাতিত্বে এবং বিধাতার অন্যায় কৃপাহীনতায় ছোটবাবু মহাশয় কখনই আপনার

হৃদয়-বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ করিতে পারিতেন না; মনের অতৃপ্তিতে জাগরিত অবস্থায় তাঁহাকে যামিনী যাপন করিতে হইত। তাহার উপর অর্ব্বাচীন পাওনাদারগণের অন্যায় তাগাদা! কি অশান্তি! কি অশান্তি! শিখিগণ আপনাদের নৃত্যকলার পরিচয় প্রদান করিয়াও এ অতৃপ্তির এ অশান্তির উপশম করিতে পারিত না! প্রস্ফুট প্রসূনগণ আপনাদের সন্ধ্যা-কালীন হাস্যোল্লাস দেখাইয়া এ অতৃপ্তি, এ অশান্তি অপনয়ন করিতে পারিত না;—সকল আনন্দের মধ্যেই, কুসুম মধ্যে বিষধরের ন্যায়, অতৃপ্তি ও অশান্তির বিষ লুক্কায়িত থাকিত।

হায়! কে বলিবে বাঙ্গালার কত জমীদারের বাটীতে এই অতৃপ্তি, এই অশান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘাসের বাগান।

ছোটবাবু মহাশয় যে আম্রকাননের অর্দ্ধাংশে উদ্যানবাটী ও পুষ্পবাটিকা রচিত করিয়া কুসুমগণের হাস্যোল্লাস এবং শিখিগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন, এবং পার্শ্বচরগণের জয়গান শ্রবণ করিতেছিলেন, আমরা দেখিব, তাহার অপরার্দ্ধ ভূমি লইয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতা কি করিলেন।

জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত করুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় আপন জীবদ্দশাতেই আপন অর্দ্ধাংশ বাগান বাৎসরিক চারিশত টাকা খাজনায় এক ব্যক্তিকে দশ বৎসরের জন্য ইজারা বিলি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকিশোরের মাতা এই ইজারার জন্য যে খাজানা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না; সমস্তই ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেন। এইরূপে দশবৎসর বিগত হইলে, ঐ সঞ্চিত অর্থ কুশীদস্ফীত হইয়া কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ সহস্র মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল।

দশ বৎসর পরে, ইজারাদার প্রজা গোমস্তার নিকট আসিয়া জ্ঞাপন করিল যে, সে ঐ বাগান হইতে একটুও লাভবান হইতে পারে নাই; এজন্য সে পুনরায় বাগান জমা লইতে ইচ্ছা করে না।

গোমস্তা কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকট তাহা নিবেদন করিল।

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃষ্ণকিশোরের মাতা কহিলেন,—"তুমি প্রজার কাছ থেকে ইজারা পাট্টা খানা ফেরত নিয়ে, সেরেস্তার খাতায় জমা ইস্তফা লিখে নাও। আর ঐ বাগানের খাজনা বাবদ ব্যাঙ্কে যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তা তুলে এনে সেরেস্তার তহবিলে মজুদ রাখ। ঐ টাকা খরচ করে আমি ঐ বাগানের ভেতর দু'লাখ ইট তৈরী করাতে চাই।"

গোমস্তা কর্ত্রীঠাকুরাণীকে মাতার ন্যায় ভক্তি এবং জাগ্রত দেবতার ন্যায় ভয় করিত। সে কখনও, তাঁহার কোন কথার প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ভাবিল যে, হয়ত কর্ত্রীঠাকুরাণী বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বাগানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া দুইলক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে, অনেক ফলবান আম্রবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে বার্ষিক চারিশত টাকা আয়ের সম্পত্তিটা একেবারে মাটী হইয়া যাইবে। কথাটা কর্ত্রীঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। অতএব সে সভয়ে কহিল,—"মা দু'লাখ ইটের জন্যে বাগান থেকে মাটী তুলতে হলে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক আম গাছও কেটে ফেলতে হবে; তাতে বাগানে মুনফা অনেক কমে যাবে।"

কর্ত্রী বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখ, যে প্রজা ঐ বাগান ইজারা নিয়েছিল, সে পাকা ব্যবসাদার লোক। সে যখন আমাদিকে বছরে চারশ টাকা মাত্র দিত ...

দশ বছরে কিছুই লাভ করতে পারলে না, তখন আমরা ও থেকে বড় কিছু লাভ করতে পারব না। বরং বাগান দেখ্‌বার জন্যে ঘর থেকে টাকা দিয়ে লোক রাখ্‌তে হবে। আর এখন লোকে জেনেছে যে ও বাগান থেকে কিছুই লাভ হয় না; এখন ও বাগানটা বিলি করাও চল্‌বে না; এখন কেউই বছরে দু'শ টাকা খাজনা দিয়েও: ও বাগান নেবে না। সে জন্যে আমি মনে করেছি যে, ঐ বাগানের বেশী ভাগ গাছই কেটে বিক্রি করে ফেল্‌ব।"

সম্পত্তির ক্ষতিকারক এই প্রস্তাব শুনিয়া গোমস্তা মনে করিল যে কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রিয়তম পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-বশতঃ তাহার জন্য, ছোটবাবু মহাশয়ের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এক বাগান বাটী প্রস্তুত করাইবেন। ইহাতে বৃদ্ধের মনে একটা হর্ষ বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল। তাহার বালক প্রভু যথাকালে বাগানবাটীরূপ এক পরম সম্পদ উপভোগ করিবে, ইহাতে তাহার মনটা আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু কর্ত্রীঠাকুরাণীর আদেশে ততগুলা ফলবান বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া বৃদ্ধের মনটা বড়ই দমিয়া গেল। কিন্তু কর্ত্রীঠাকুরাণীর আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে সে সাহস করিল না। সে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃক্ষ সকল ছেদন করাইয়া বিক্রয় করিতে লাগিল; এবং মৃত্তিকা খনন করাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিল।

বর্ষার শেষে ইষ্টক প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল; শীতের

অবসানে ইষ্টক প্রস্তুত শেষ হইল। যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহা একটী বৃহৎ খাদে পরিণত হইল। কর্ত্রীঠাকুরাণীর আদেশে ঐ খাদ সুসংস্কৃত করিয়া একটি নাতিবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত হইল। সরোবরে নামিবার জন্য রক্তবর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী রচিত হইল। ঠিক সোপান শ্রেণীর উপরে চাঁদনী প্রস্তুত না করাইয়া গৃহিণীর আদেশে অনেকটা দূরে একটী বৃহদাকার চাঁদনি প্রস্তুত হইল; ঐ চাঁদনির নিকটে কয়েকটা আম্রবৃক্ষ অকর্ত্তিত অবস্থায় রহিল। সরোবরের অন্যদিকে বাগানের উত্তর সীমান্তে এক সারি দক্ষিণদ্বারী কক্ষ প্রস্তুত হইল। প্রস্থে সমস্ত কক্ষ গুলিই একরূপ হইল বটে, কিন্তু মধ্যভাগের তিনটি কক্ষ অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। অবশেষে বাগানের অবশিষ্ট সমুদয় ভূমি লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত করিয়া তাহাতে দুর্ব্বাদল রোপিত হইল। কালক্রমে দুর্ব্বাদল বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত বাগানটি বিপুল তৃণভূমিতে পরিণত হইল—কেবল মাঝে মাঝে দুই একটী আম্রবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া ছায়া দান করিতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইতে প্রায় দুই বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণকিশোর অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়স্ক তরুণ যুবক। সে তখন আই, এ, পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া বাটী আসিয়াছিল। সে ঐ বাগানে বেড়াইতে যাইত এবং প্রশংসমান নয়নে বুদ্ধিমতী মাতার কার্য্য সকল অবলোকন করিত।

কিন্তু ঐ বাগান দেখিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধ কেহই প্রীতি লাভ করিতে পারে নাই। বালকগণ ভাবিত যে, উহাতে যদি মাঝে মাঝে দুই একটা বৃহৎ বৃক্ষের বাধা না থাকিত তাহা হইলে উহা ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার জন্য ক্রীড়াভূমি হইতে পারিত; বর্ত্তমান অবস্থায় উহা ক্রীড়াভূমিরও অনুপযুক্ত। বৃদ্ধেরা মনে করিত, ফুলশূন্য বাগানের সার্থকতা কি?

সেই অদ্ভুত বাগানের কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত ছোট বাবু মহাশয় কি করিলেন? তিনি প্রথমতঃ বাগানটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পার্শ্বচরগণকে লইয়া বাগানবাটীর দ্বিতলের ছাদে উঠিলেন। তথা হইতে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র অবলোকন করিয়া উচ্চরোলে হাস্য করিলেন; এবং হাসিতে হাসিতে পার্শ্বচরগণকে কহিলেন,—"বড় বৌঠাকরুণ ঘাসের বাগান করেছেন। হাঃ, হাঃ, হাঃ!"

পার্শ্বচরগণ তারস্বরে হাসিল,—"হেঃ, হেঃ, হেঃ! ঘাসের বাগান!"

একজন সুরসিক হাস্যের দ্বারা আপনার সুরসিকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহিল,—"ছোটবাবু মশাই! আপনি এইবার একটা সেওড়া গাছের বাগান করুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেমাভিনয়।

সরোবরে সলিল না থাকিলে সরোজিনী ফুটে না; উপন্যাসে প্রেমকথা না থাকিলে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও আনন্দ প্রবাহ ছুটে না। লবণের অভাবে ব্যঞ্জন যেমন বিস্বাদ হইয়া যায়, তাম্বূলের অভাবে তন্বীর রক্তাধর যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, তৈলের অভাবে সুকেশিনীর কেশরাশি যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, প্রেম প্রস্তাবনার অভাবে আমার এ উপন্যাস তেমনই বিস্বাদ, বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শ্যাম শস্পক্ষেত্র, কুসুম কানন, মুকুরনিন্দিত বারিপূর্ণ বাপী—এ সকলই প্রেমরাজ্যের সামগ্রী; আমার এই উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে আমি যত্ন পূর্ব্বক এ সমস্তই আনায়ন করিয়াছি বটে, এবং তাহাতে ময়ূরের নৃত্যও দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু এযাবৎ একটি যথার্থ প্রেমিক দম্পতিকে তোমাদের আগ্রহময় নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি নাই—নবীন প্রেমের একটি মধুর চিত্র এ আখ্যায়িকায় ইতিপূর্ব্বে চিত্রিত করিতে পারি নাই। আমি ভাল চিত্রকর নহি, তাহার উপর বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

জানি, বৃদ্ধের এই অপটু হস্তে প্রেমের পট ভাল ফুটিবে না।

—াপ তোমাদের অসন্তোষের ভয়ে আমি একটু ক্ষুদ্র প্রেমাভিনয় দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দুঃখের বিষয় আমাদের প্রেমিকের একটু বয়োবৃদ্ধি হইয়াছিল; আমাদের প্রেমিকাও নিতান্ত নবীনা নহে। কিন্তু দুগ্ধ ঘন হইলে এবং তজ্জন্য তাহার পাচকতা নষ্ট হইলেও যেমন তাহার মধুরতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বয়োধিকের ঘনীভূত প্রেম তরুণগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুষ্পাচ্য হইলেও, তেমনই তাহার মিষ্টতা আরও বাড়িয়া যায়। বদ্‌হজম ও বক্ষোদাহের ভয় রাখিয়া তোমরা এই দুষ্পাচ্য মিষ্ট সামগ্রী সাবধানে উপভোগ করিও।

শান্তিময়ী দ্বাবিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াও বঙ্গনারী কিরূপে যুবতী রহিল? হাঁ, আমরা তাহাকে যুবতীই বলিব। তাহার পরিপূর্ণ দেহতটে তখনও যৌবন তরঙ্গ আছাড়াইয়া পড়িতেছিল; তাহার সুগোল ও কুসুমকোমল বাহুতে, তাহার পৃথুল উরসে তখনও নবীন যৌবনের ললিত লালিত্য উছলাইতেছিল; তাহার বিলোল নয়নে, রক্তাভ কপোলে, নধর অধরে তখনও নবীন যৌবনবিলাসলীলা করিতেছিল; ভরা যৌবনভারে সে তখনও কুসুমভারাবনতা প্রসূনবল্লরীর ন্যায় দুলিতেছিল। সেই পরিপূর্ণ যৌবন লইয়া, সেই যৌবন পুষ্ট দেহ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, সেই নধর অধর সুগন্ধী তাম্বুলরাগে সৌরভময় ও আরক্ত করিয়া প্রেমময়ী শুভ্র কোমল শয্যার উপর নবগত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া ছিল।

শান্তিময়ীর স্বামীর নাম অনাথবন্ধু মিত্র। বাল্যকালে তিনি

মাতাপিতৃহীন হওয়ায়, তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসী মাতুল তাঁহাকে আপন ভাড়াটীয়া বাসায় স্থান দান করিয়াছিলেন। সেখানে বাস করিয়া তিনি বহু দারিদ্র্যক্লেশ সহ্য করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবং পরে একজন ইঞ্জিনিয়র হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য পাইয়া, তাঁহাকে দূরদেশে—পাহাড়ে, জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত। এজন্য প্রথম যৌবনে তাঁহার বিবাহের সুযোগ ঘটে নাই। পরে তেত্রিশ বৎসর বয়সে পতি-পালক মাতুলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি শান্তিময়ীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শান্তিময়ী এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা; বিবাহের পর হইতে এযাবৎ কাল সে পিত্রালয়েই অবস্থিতি করিতেছিল, ইঞ্জিনিয়র বাবু তাহাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া মাতুলকে বিব্রত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পরন্তু শান্তিময়ীও দরিদ্র মামাশ্বশুরের পদসেবা করা অপেক্ষা পিতৃগৃহে স্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিত হইতেই ভালবাসিত; তাহার উপর, অনাথবাবুর নিজের বাসস্থানেরও কোনও স্থিরতা ছিলনা—কখনও তাম্বুতে, কখনও ডাকবাংলায়, কখনও কোনও বদান্য জমীদারের কাছারী বাটীতে, কখনও বা অস্বাস্থ্যকর সামান্য ভাড়াটীয়া বাটীতে বাস করিতে হইত; এই সকল কারণে শান্তিময়ী পিতৃগৃহেই থাকিয়া গিয়াছিল। এখন ইঞ্জিনিয়র বাবু কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াছিলেন। এযাবৎ একাকী থাকিয়া তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি কলিকাতার মৃজাপুর অঞ্চলে এক ত্রিতল বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল উদ্যোগ শেষ করিয়া তিনি

পত্নীকে ও তাঁহার ছয় বৎসরের শিশুকন্যাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরের কর্ম্মস্থানে আসিয়াছিলেন।

তিনি যখন শ্বশুর বাটিতে প্রবেশ করিলেন, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছিল। তখন শ্বশুর মহাশয় কাছারীতে বসিয়া মকর্দ্দমা শুনিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী গৃহস্থালীর দ্বিপ্রাহরিক কার্য্য সকল সমাধা করিয়া নাতিনীকে ক্রোড়ে লইয়া মধ্যাহ্ন নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন রাজপথের পথিকগণ মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শান্তিময়ীর হৃদয়টা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় নিতান্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শান্তিময়ীর ছোট ভাই, তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া তাহাকে শুভসংবাদ প্রদান করিয়াছিল, 'জামাই বাবু এসেছেন।' তাহার পর তাহার আদেশে ঝি জামাই বাবুকে তাহার শয়নকক্ষে ডাকিয়া আনিয়াছিল। এইরূপে একবৎসর পরে স্বামীর সহিত বিরহিণী স্ত্রীর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্ম্মশালায় যে হস্ত পুষ্ট ও কঠিন হইয়াছিল, সাঁড়াশীর ন্যায় সেই কঠিন করপুট মধ্যে পার্শ্বোপবিষ্টা পত্নীর কমলদলনিন্দিত কোমল করতল গ্রহণ করিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু আদরে তাহা নিপীড়িত করিয়া কহিলেন—"খুকী কোথায়?"

সেই কঠিন স্পর্শে বহুবিরহবিদগ্ধা শান্তিময়ীর হৃদয় মধ্যে তপ্তশোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহার গোলাপদলতুল্য গণ্ড আরও আরক্ত হইয়া উঠিল; বিশাল বিলোল নেত্রে স্বামীকে অবলোকন করিয়া কহিল—"খুকী তার দিদিমার কাছে ঘুমুচ্ছে।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার উপর, আজ এক বৎসর সেই স্নেহের পুত্তলির কমল মুখ খানি নিরীক্ষণ করেন নাই। তিনি আগ্রহের সহিত কহিলেন—"তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস। কতদিন দেখিনি, দেখব।"

শান্তিময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল; হায়? তাহার স্বামীর চক্ষে কন্যার মাতা অপেক্ষা কন্যাই কি বড় হইল? কিন্তু তাহার আনন্দ প্লাবিত হৃদয়ে সে ব্যথা অধিকক্ষণ স্থান লাভ করিতে পারিল না। সে প্রণয়াবেগে আপন নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া আপন শ্লথ দেহ স্বামীর তপ্ত ক্রোড় মধ্যে লুটাইয়া দিয়া কহিল, "দেৎ, এখন কেন? এখন যে সে বড় বিরক্ত করবে।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু উৎসঙ্গশায়িতা পত্নীর আনন্দিত দেহ আপন বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার উৎফুল্ল অধরে গাঢ় চুম্বন মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "না, না, সে কিছুই বিরক্ত করবে না; বরং আমাকে দেখ্‌লে কত আহ্লাদ করবে। তাকে নিয়ে এস।"

কন্যাকে দেখিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার বাবুর এই আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তোমরা হয়ত সন্দেহ করিবে যে, পত্নীর সুধাধরের মধুরতা বা তাহার অমল বক্ষের কোমলতা তাঁহার প্রাণস্পর্শ করে নাই;—খুকীই তাঁহার সমুদয় অন্তরাভ্যন্তর জুড়িয়া বসিয়াছিল। এ সন্দেহ শান্তিময়ীর হৃদয়ের উপরও একটু ছায়াপাত করিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই উজ্জ্বল আনন্দালোকে সে ছায়া বিদূরিত হইল।

কন্যাসম্বন্ধে স্বামীর বাক্যের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সে আবেগময় অধরোষ্ঠের দ্বারা স্বামীর অধরোষ্ঠ স্পর্শ করিল; তাহার পর প্রেমভারাক্রান্ত নয়নে স্বামীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সে প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল,—"দেখ একদিন রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। সেদিন স্বপ্নের ঘোরে তোমার মুখে যে কত চুমো খেয়েছিলাম, তার ঠিক নাই।"

ইঞ্জিনিয়ার বাবু হাসিয়া কহিলেন,—"আজ জাগ্রত থেকে তার চেয়ে বেশী খেও; তাতে আমি একটুও আপত্তি করবো না; বরং ছেলের হাতে যেমন চুষিকাঠি দেয় তেমনই আমার ঠোঁট-জোড়াটা তোমার হাতে ছেড়ে দেবো। কিন্তু এখন একবার খুকীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

খুকী! খুকী! এই প্রবল প্রণয়াভিনয়ের মধ্যে খুকীর স্থান কোথায়? শান্তিময়ীর অন্তরমধ্যে কিঞ্চিৎ অভিমান সঞ্চারিত হইল;—হইবারই কথা। সে আপন রক্তাধর স্ফুরিত করিয়া বলিল,—"তুমি কেবল খুকীর কথাই বলছ। কেন আমি কি তোমার কেউ নই?"

সেই স্ফুরিত অধর চুম্বিত করিয়া ইঞ্জিনিয়ার বাবু কহিলেন, "তুমি ভুল বুঝলে, শান্ত। তোমাকে আমি কতটা ভালবাসি, তা তুমি কি জান না? কিন্তু যে আকাশ দেখতে ভালবাসে, সে সেই আকাশের কোলে পূর্ণচন্দ্র দেখলে আরও সুখী হয়।—আমি তোমাকে খুব ভালবাসি বলেই, তোমার কোলে তোমারই গর্ভজাত মেয়েকে দেখলে আরও সুখী হই। তখন তুমি পূর্ণ

হও। আঙুরলতার আঙুরের থোলো ঝুল্‌লে যেমন তাহার শোভা আরও বেড়ে যায়, তখন তেমনি তোমার শোভা একশ'-গুণ বেড়ে যায়। সদাশিব যেমন গণেশজননীকে আপন কোলে বসিয়ে পরমানন্দ লাভ করেন, তুমি খুকীকে কোলে নিয়ে আমার কোলে বস্‌লে আমার তেমনই আনন্দ হবে।

শান্তিময়ী লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কহিল,—"ছি! ছি! তুমি কি বল তার কিছুই ঠিক নেই। সেই ধাড়ি মেয়েকে কোলে নিয়ে তোমার কোলে বস্‌বো? সে যখন তার দিদিমাকে সে কথা বলবে? ছি ছি! তোমার একটুও বুদ্ধি নেই।"

স্বামী যে কতটা বুদ্ধিহীন. তাহা শান্তিময়ী কালক্রমে আরও ভালরকম বুঝিতে পারিবে; কিন্তু এখন তাহার, স্বামীর বুদ্ধির পরিমাণ মাপিবার অবসর ছিল না। তখন তাহার হৃদয়ে প্রেমের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। সে আপন তরঙ্গায়িত অঙ্গের দ্বারা স্বামীর অঙ্গ নিপীড়িত করিল; বুভুক্ষু বক্ষঃ আলিঙ্গন-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া যেন আরও স্ফীত হইয়া উঠিল। সুমিষ্ট সরস অধর দ্বারা স্বামীর সরস অধর পান করিয়া তাঁহার ও আপনার বাক্য নিঃসরণের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

প্রণয়ভাষণ যদি রুদ্ধ হইয়া রহিল তবে তোমরা আর কি শুনিবে? আমরাই বা কি লিখিব? অগত্যা এইখানেই এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

গোশালা

বড়বধূঠাকুরাণীর সেই ঘাসের বাগান ক্রমে গোশালায় পরিণত হইল। দুই হাজার টাকা মূল্যে ত্রিশটি দুগ্ধবতীগাভী ক্রয় করা হইল। তিনটি দীর্ঘাকৃতি কক্ষে তাহাদিগের ও তাহাদিগের বৎসগণের স্থানসংকুলান হইল। তাহাদিগের রক্ষাণাবেক্ষণ ও দোহন জন্য মাসিক দশটাকা হিসাব বেতনে বাগ্দীজাতীয় বলিষ্ঠ লোককে নিযুক্ত করা হইল; এতদ্ব্যতীত দুগ্ধবিক্রয় ও গাভীদের খাদ্যক্রয়জন্য মাসিক পনের টাকা বেতনে একজন সরকার নিযুক্ত হইল। শ্বেত, ধূসর, পাটল গাভীসকল, নানা-বর্ণের পুষ্পাবৃত সচল পুষ্পগুল্মের ন্যায়, সুন্দর তৃণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

এই স্থানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। দোহন ও রক্ষণ জন্য কৃষ্ণকিশোরের মাতা বাগ্দীজাতীয় লোক কেন রাখিলেন? কেন, তাজপুরগ্রামে কি গোপজাতীয় পারদর্শী সমর্থ লোক পাওয়া যাইত না? আমরা জানি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাজপুরের গোয়ালাপাড়ায় ভীমকল্প শত শত গোপ, গোপবধূর সরস প্রেম উপভোগ করিয়া, পরমসুখে দিনাতিপাত করিত। তাহারা গোপালন করিত, গুরুভার বাঁক বহন করিতে পারিত, তাহারা দুগ্ধবিক্রয়দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত এবং সেই অর্থের দ্বারা

পুত্র পৌত্রগণকে সুসজ্জিত করিয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ে রাজভাষা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিত। তাহারা কোথায় গেল? তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সময় হইয়াছিল, মরিয়া গিয়াছে, দুই একজন এখনও বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় এখনও জীবিত আছে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষিত বংশধরগণ কোথায় গেল? ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, অনুসন্ধান কর, তোমরা তাহাদিগের সন্ধান পাইবে। একজন আছেন পেশোয়ারে; তিনি দিনের বেলায় মাসিক ত্রিশটাকা বেতনে বুকিং বাবুর উচ্চাসন অধিকার করেন; এবং রাত্রে পাত্রের পর পাত্র সরাব খাইয়া পেশোয়ারী মুসলমান সতীর পবিত্র প্রেম উপভোগ করেন। একজন আছেন রংপুরে; তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাটব্যাবসায়ী এক শ্বেতাঙ্গ বণিকের আফিসে পঁচিশ টাকা বেতনে ডেস্‌প্যাচ ক্লার্কের কার্য্য করেন, এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত চিররুগ্ন পুত্রগণের পরিচর্য্যা করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সেমিজ ও ব্লাউজ পরা ভব্যা পত্নীর তিরস্কার লাভ করেন। একজন দুই হাজার টাকা জামীন দিয়া, ইষ্টার্ণ ট্যাঙ্গারী কোম্পানী নামক চামড়ার কারখানায় সত্তর টাকা বেতনে ক্যাসিয়রের কার্য্য করিতেন; একদিন তহবিলের টাকা কম পড়িয়া যাওয়ায়, তিনি হাওড়ার কারাগারে বাস করিয়াছেন। একজন ঘর্ম্ম ও তৈল-সিক্ত মলিন চাপকান গায়ে দিয়া মৃজাপুরে মোক্তারি করিতেছেন; আর একজন জিনের পোষাক পরিধান করিয়া লিলুয়াতে রেল যাত্রীদের নিকট টিকিট আদায় করিতেছেন। আমাদের ভূষণ

গোয়লার ছেলে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঘোষ বি, এ, পাশ করিয়া বর্দ্ধমানে মাষ্টারি করিতেন এবং চল্লিশ টাকা বেতন পাইয়া, বাড়ী ভাড়া, ঝির মাহিনা, দুধের, মুদীর ও ধোবার পাওনা, পরিবারের বায়না ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া অবশিষ্ট অর্থে নিজের ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট দেহের এবং পত্নীর অম্লরোগাক্রান্ত জীর্ণ অবয়বের এবং পুত্র কন্যাগণের চিরক্ষুধিত উদরের পথ্য সংগ্রহ করিতেন ; কিন্তু আজ তাঁহার সেই চল্লিশ টাকা বেতনের চাকুরীটিও গিয়াছে ; তাই তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন, আবার কোথায় চাকুরী পাইবেন, আবার কিরূপে পরিবারগণের আহার যোগাইবেন। ভাই, তোমরা আমার কথা শোন, তোমরা আর চাকুরী চাকুরী করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইও না। তোমরা আবার তাজপুরে ফিরিয়া গোপালন করিয়া স্বদেশের দুগ্ধ কষ্ট নিবারণ কর। দেশের শিশুদের কচি কচি মুখগুলি দুগ্ধ অভাবে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, ভাই, তোমরা কি দূরে থাকিয়া তাহা চাহিয়া দেখিবে ? কৃষ্ণ-কিশোরের মাতা গোপালন করিয়া এবং তদ্দারা পল্লিশিশুগণের জন্য নির্ম্মল দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া আপনার মাতৃ হৃদয়ে যে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা যেন সকলেই সেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পার।

তথাপি কৃষ্ণকিশোরের মাতা পল্লিশিশুগণকে বিনামূল্যে দুগ্ধ প্রদান করিতেন না। তিনি কেবলমাত্র স্বল্প মূল্যে অকৃত্রিম দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। তখন তাজপুরে ও তাজপুরের নিকটবর্ত্তী

পল্লিগ্রাম সমূহে টাকায় চারি সের হিসাবে খাটী দুগ্ধ বিক্রয় হইত ; কিন্তু খাটী দুধ সকল সময় জলশূন্য বা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণকিশোরের মাতার গোশালায় টাকায় আট সের হিসাবে দুগ্ধ বিক্রয় হইত, এবং তাহা সর্ব্বদা নির্জ্জল ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইত। তাঁহার আদেশ ছিল যে অতি প্রত্যূষ হইতে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত, এবং পুনরায় বেলা তিন প্রহর হইতে রাত্র এক প্রহর পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে গাভীগুলি গুলির দোহন কার্য্য চালবে ; এই সুবিধানের ফলে তাঁহার ক্রেতাগণ সর্ব্বদাই নির্ম্মল ও নবীন দুগ্ধ প্রাপ্ত হইত। তাঁহার আর একটি সুনিয়ম ছিল ; সেই নিয়মের বলে, যে সংসারে শিশু সন্তান থাকিত, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে দুগ্ধ ক্রয়ের অধিকারী হইত। তাঁহার গোশালার দুগ্ধ যাহাতে দুগ্ধব্যবসায়ীগণের হস্তগত না হয় তদ্বিষয়েও তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন

দশম পরিচ্ছেদ

শান্তিময়ীর অশান্তি।

স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিয়া শান্তিময়ী এক বৎসর কাল পরম শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিল। রাত্রে প্রেমলীলা, মধ্যাহ্নে সুখনিদ্রা, সন্ধ্যায় সার্কাস বায়োস্কোপ থিয়েটার প্রভৃতির দর্শন, আফিসের ছুটির দিনে স্বামী ও কন্যার সহিত যাদুঘর, পশুশালা ঘোড়দৌড় প্রভৃতির পরিদর্শন,—আহা কি সুখেই, কি তৃপ্তিতেই, কি শান্তিতেই শান্তিময়ীর দিনগুলি সুধার প্রবাহের ন্যায় চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু একবৎসরের পরেই শান্তিময়ীর অশান্তির কারণ ঘটিল। এক বৎসর পরেই সে বুঝিতে পারিল তাহার স্বামিটী মোটেই সুবুদ্ধি নহেন। শান্তিময়ী ক্রমে দেখিল যে, তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীটা আপন শান্তিময় নিকেতনে, এক একটি মূর্ত্তিমান অশান্তির ন্যায়, এক একটি কুপোষ্যকে স্থান দান করিতেছেন। মাতুলের মৃত্যু ঘটায় অসহায় মাতুলানী ও তাঁহার তিনপুত্রকে তাহার মূর্খ স্বামী আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন; ইহাতে শান্তিময়ীর মানসিক অশান্তি অসহ্য রকম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কেন অকারণ এত গুলি লোকের ভরণ পোষণের ভার আপন স্কন্ধে বহন করিয়া পরিশ্রম লব্ধ টাকা গুলাকে ভগ্নমৃত্তিকাপাত্রের

টুক্‌রার ন্যায় নষ্ট করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? হায় হায়! ইঞ্জিনিয়র বাবু আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট করিতেছিলেন।

আরও দুই এক বৎসর পরে কলিকাতায় দুই একটি ভদ্রপরিবারের সহিত শান্তিময়ীর পরিচয় ঘটিল। তখন শান্তিময়ী আর কিছুতেই সন্তুষ্টা থাকিতে পারিল না। ইঞ্জিনিয়র বাবু তাহাকে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন, তাহা পাইয়া সে একটুও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। সে দেখিত, অন্য লোকের স্বামীর ন্যায় তাহার স্বামী কোন দ্রব্যই পছন্দ করিয়া কিনিতে পারেন না। স্বামী তাহাকে চারিশত টাকা মূল্যে যে চূড়ী গড়াইয়া দিয়াছিলেন, ডেপুটীবাবুর পত্নীর তিন শত টাকা মূল্যের চুড়ি তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। তাহার পরিচিতাগণের সুবোধ স্বামীগণ পত্নীগণকে কেমন পছন্দ সই পাড়ের কাপড় কিনিয়া দেন; আর তাহার নির্ব্বোধ স্বামী সেই আন্তকালের পুরাতন পচা পাড়ের কাপড় ব্যতীত, অন্য কোনও রকমারী পাড় দুই চক্ষুর মস্তিষ্ক আহার করিয়া, দেখিতে পান না;—রাম, রাম! সেই প্রকার কদর্য্য পাড়ের কাপড় পরিয়া কেহ কি কখন ও পল্লিবাসিনী গণের সমক্ষে বাহির হইতে পারে?

স্বামীর বাটীতে শান্তিময়ীর আরও অশান্তির কারণ ছিল। বলা বাহুল্য তাহার বুদ্ধিহীন স্বামীই সকল অশান্তির মূল কারণ। ভবানীপুরের সব্‌জজবাবু হাজার টাকা বেতন পান, শ্যামবাজারের সেক্রেটারী বাবু বার শত মুদ্রা বেতন পান, পদ্মপুকুরের ম্যানেজার

বাবু দেড় হাজার টাকা বেতন পান, আর তাহার স্বামী মোটে আট শত টাকা বেতন পান!—কি হেয় অপদার্থ স্বামী! এমন স্বামীতে কি কেহ কখন তুষ্টা থাকিতে পারে? অন্য ইঞ্জিনিয়রগণ কত উপরি পাওনা পান, এবং সেই টাকা ব্যয় করিয়া বিশ্রী ও বোঁচা পত্নী বা প্রেতিনীদিগের সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া দেন; আর তাহার স্বামী, যদি ধর্ম্মের ভান না করিয়া, উপরি পাওনা লইতেন তাহা হইলে, মাছে, দইয়ে, ক্ষীরে রসগোল্লায় সন্দেশ এবং ঘৃত ইত্যাদিতে তাহাদের বাটীত ভাসিয়া যাইতই, তাহার উপর নিজে পদের উপর পদ সংস্থাপন করিয়া নবাবের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেন, এবং সর্ব্বোপরি স্বামীগতপ্রাণা শান্তিময়ীর স্বর্ণাঙ্গে কেবল মাত্র দুই এক খানি পিত্তল সদৃশ স্বর্ণের অলঙ্কার না পরাইয়া, তাহার বরাঙ্গ হীরা মুক্তায় মণ্ডিত করিয়া দিতে পারিতেন। হায়, হায়! যাহার স্বামী চাকুরী করিতে যাইয়া উপরি পাওনা আনিতে পারে না, তাহাকে ধিক! শত ধিক!

যদি পাচক, পরিচারক বা পরিচারিকাগণের মধ্যে কেহ পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত, এবং তজ্জন্য যদি শান্তিময়ীকে অগত্যা পাকশালায় প্রবেশ করিতে হইত, বা কোমল করে সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিতে হইত তাহা হইলে, সে ভাবিত যে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহার মত অধর্ম্মের ভোগ আর কাহাকেও উপভোগ করিতে হয় না।—হাতে বেড়ী ধরিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়াছে; হাঁড়ী নাড়িয়া তাহার পদ্মের মত মুখখানি

হাঁড়ীর তলার মত, কালো হইয়া গিয়াছে, অগ্নির উত্তাপে তাহার সরল দেহ, ইন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; সম্মার্জ্জনীর ধূলায় তাহার চিক্কণ চিকুর দাম ধূষর হইয়া গিয়াছে।—হাঁগা! ঐ ধূলা ঐ ধূম, ঐ অগ্নি বারমাস এবং ত্রিংশ দিবস সহ্য করিয়া শান্তিময়ী কি শান্তিময়ী থাকিতে পারে? আপন ধর্ম্মপত্নীর প্রতি ইঞ্জিনিয়র বাবুর যদি একটি ক্ষুদ্র সর্ষপ পরিমাণও আস্থা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময়ী পত্নীর অবস্থায় কাতর হইয়া এই দণ্ডে, এই ক্ষণে একটা পাচক বা পরিচারিকার স্থলে দশটা পাচক ও পরিচারিকা আনিয়া দিতে পারিতেন। হাঁগা ইহাও কি একটা সম্ভব কথা হইল, যে এই প্রকাণ্ড কলিকাতা সহরে তুচ্ছ একটা বামুন আর একটা চাকরানী মিলে না?

যে গৃহ স্বামীর পোষ্যবর্গের অবিরাম কোলাহলে সর্ব্বদা বিধ্বনিত, যে গৃহে দাসদাসী স্থায়ী সামগ্রী নহে, যে গৃহের স্বামী গৃহস্বামিনীর ইচ্ছানুযায়ী বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করিতে পারেন না, সেই গৃহে শান্তিময়ী কিরূপে প্রশান্ত মনে বাস করিবে?

দিবসের শ্রমজনক পরিশ্রম সমাপনান্তে, প্রেমময়ী পত্নীর প্রীতিভরা মুখ দেখিবার প্রত্যাশায়, বাটী ফিরিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু সে মুখে প্রত্যহ ঐ অশান্তি, ঐ অতৃপ্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতেন। দেখিয়া তাঁহার প্রত্যাশান্বিত প্রফুল্ল হৃদয়, নির্ব্বাপিত-দীপ উৎসব কক্ষের ন্যায়, ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। না জানি, আমাদের এই সুন্দর বঙ্গদেশে কতগুলি প্রফুল্ল হৃদয় প্রত্যহ

এইরূপ অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাইতেছে ! তোমরা জ্ঞানালোকময়ী প্রীতিময়ী, পতিপরায়ণা বঙ্গললনা, তোমরা এ কথার উত্তর দাও।

একদিন ইঞ্জিনিয়র বাবু বাটী প্রত্যাগমনের পথে ভাবিলেন যে, দূর বিদেশে কর ছড়াইয়া প্রভাত-দিবাকর যখন আবার পূর্ব্বাকাশের দ্বারে দেখা দেন, তখন প্রভাত-নলিনী নীর্ম্মল নীহার বিন্দুটি ক্রোড়ে লইয়া কেমন প্রফুল্ল মুখে তাঁহার আগমন পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, রজনীনাথের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় রজনীদেবী, বহুসন্তানের জননীর ন্যায়, নক্ষত্রগুলিকে বক্ষে লইয়া কেমন হাসিমুখে নানা পুষ্পের গন্ধ ছড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আজ হয়ত তিনিও দেখিবেন যে তাঁহার শান্তিময়ী, খুকীর শিশির কণার ন্যায় নির্ম্মল এবং তাহার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, দেহটী ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় হাসিমুখে বহির্দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে মধুর কাব্যরসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তিনি বাটী ফিরিলেন, গৃহিণীর অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি হৃদয়মধ্যে একটা কষ্টকর বেদনা অনুভব করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"দেখ শান্ত, সমস্তদিন পরিশ্রম করে বাড়ী ফিরে এসে যদি তোমার হাসিমুখ দেখতে না পাই, তাহলে আমার মনটা কি রকম হয়, বল দেখি ?"

শান্তিময়ী আপন অপ্রসন্ন ললাট ব্যঙ্গতরঙ্গে তরঙ্গিত করিয়া কহিল,—"ওঃ! ভারি ত পরিশ্রম! গাড়ী চড়ে, পোষাক প'রে

রাস্তায় পাঁচ রকম জিনিষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আফিসে যা'ন; তার পর কলের পাখার তলায় গদীমোড়া চেয়ারে আরাম করে বসে দু এক ছত্র লেখেন আর হুকুম চালান—এই ত তোমার কাজ আর পরিশ্রম। আর আমি যে সেই ভোর বেলা থেকে সেই রাত দুপুর পর্য্যন্ত ছিষ্টি সংসারের হাজার খুঁটিনাটিতে দিনারাত হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটি, রেঁধে রেঁধে শরীর কালী করি;—তার বেলা? এত খাটনি, তার উপর, একটা ভাল কথা নেই, গায়ে পরবার মত একখানা গহনা নেই; বেশী কি, পরনের জন্যে পছন্দ-সই একখানা কাপড় নেই।—এতে কি আর হাসিমুখ থাকে?"

ইঞ্জিনিয়র বাবু মনে মনে জানিতেন যে গজমুক্তা ও পদ্মরাগ খচিত বেশর এবং তাহার আকর্ণ বিস্তৃত হীরকখচিত টানা অপেক্ষা একটু খানি হাসিতে তাহার পত্নীর মুখশোভা অধিকতর নয়নোপভোগ্য হয়। তিনি কহিলেন,—"শান্ত, সোনা! তুমি একটু হাস্‌লে আমি তোমাকে যেমন সুন্দর দেখি, ভাল ভাল কাপড় আর হীরা মুক্তার গহনা পরলেও কাউকেও তেমন সুন্দর দেখি নে।"

ঘোর অবিশ্বাসের ছায়ায় মুখটা আরও অন্ধকার করিয়া শান্তিময়ী কহিল,—"যদি হীরা মুক্তার গহনা পরলে শরীরের শোভা না বাড়বে, তবে তোমাকে যারা এক হাটে কিন্‌তে পারে, আর এক হাটে বেচ্‌তে পারে এমন সব বড় লোকেরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে পরিবারকে দামী দামী গহনা পরাবে কেন?

তাদের যেমন রাজার মত ঐশ্বর্য্য, মাথাতেও তেমনই রাজার মত বুদ্ধি।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু অশ্রের দ্বারা আলোড়িতচিত্তা দুর্ব্বল-হৃদয়া পত্নীকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"একটা কথা ভুলো না, শান্ত! মনে রেখো আমরা হিন্দু! হিন্দুর ভগবান বলেছেন যে তাঁর ভক্তগণ—"লোকান্নোদ্বিজতে'—অর্থাৎ লোকের দ্বারা বিচলিত হ'ন না। তুমি ভগবদ্ ভক্ত হ'য়ো, শান্ত। তুমি অন্য লোকের গহনা পরা দেখে, বা তোমার গহনা সম্বন্ধে অন্যলোকের নিন্দা শুনে কখনও নিজের মন খারাপ করো না।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু জানিতেন না যে ভগবদ্ বাক্য অপেক্ষা অখণ্ডনীয় প্রতিবাদবাক্য তাঁহার অতিপ্রাজ্ঞী পত্নীর তাম্বুলরঞ্জিত কিমাম্ সুবাসিত জিহ্বাগ্রে, কল্পবৃক্ষের ফলের ন্যায়, সর্ব্বদা দোদুল্যমান রহিয়াছে। স্বামীর উপদেশটা মূর্খের প্রলাপ মাত্র মনে করিয়া শান্তিময়ী তৎক্ষণাৎ প্রচার করিল,—"ও মা! ও মা!—"লোকে যারে বলে ছি, তার আর রইল কি?' লোকে যদি আমার পেতল পানা সোনার গহনা দেখে তোমাকে ছি ছি করে, তাহলে, তোমার অপমানের আর কি বাকী থাকলো?"

আমরা ইঞ্জিনিয়র বাবুর পত্নী শান্তিময়ীতে যে অশান্তির লক্ষণ দেখিয়াছি, তাহা আমাদের কাল্পনিক অলীকতা মাত্র;—এইরূপ কল্পনা কেবল আমাদের ন্যায় হীন ঔপন্যাসিকগণের পদার্থহীন উপন্যাসেই স্থান পায়। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ

সকলেই চির পরিতৃপ্তির প্রতিমূর্ত্তি; তাঁহারা স্বামী প্রদত্ত সামান্য সামগ্রী প্রাণাধিকের পবিত্র প্রেমোপহার মনে করিয়া আজীবন পরিতুষ্ট থাকেন; তাঁহারা আপনাদের প্রশান্ত অন্তঃকরণের প্রসন্নতায় স্বামীর সামান্য গৃহকে চিরশান্তির আবাসভূমি করিয়া তুলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আয়-ব্যয়।

গোশালা স্থাপনের এক বৎসর পরে যখন কৃষ্ণকিশোর শ্রেণীর পাঠ সমাধা করিয়া দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ অতিবাহিত করিবার জন্য বাটী আসিল, তখন বড় বধূঠাকুরাণী তাহাকে গোশালার হিসাব দেখিবার জন্য আদেশ করিলেন। মাতার অনুমতি পাইয়া কৃষ্ণকিশোর কয়েক দিন ধরিয়া গোশালার বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিল; এবং তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিল। এই তালিকা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

(আয়)

১০ বৎসর বাগান ইজারার খাজনা মায় সুদ	৫২৫০৲
৮৪০টি আম্রবৃক্ষ বিক্রয়	৩৩০০৲
অবশিষ্ট ৪০টি আম্রবৃক্ষের ফল বিক্রয়	৪৫০৲
দুগ্ধ বিক্রয়	৪৩৮০৲
	১৩,৩৮০৲

(ব্যয়)

৫ লক্ষ ইট প্রস্তুত প্রতি হাজার ৭৲ হিঃ	৩৫০০৲

গৃহনির্ম্মাণের কাঠ খরিদ	১২৫০৲
পুষ্করিণী খনন, গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য মজুরী	২৩০১.
৩০টি গাভী খরিদ	২০০০৲
গোশালার জন্য দড়ি, বালতি, কেঁড়ে, ঘটীপ্রভৃতি সরঞ্জাম	১২২৲
বিচালী ৬০ কাহন ৭৲ হিঃ ও ৬০ কাহন ৯৲ হিঃ মোট	৯৬০৲
সরিষার খোল ৩০০মন ও ক্ষুদ ভূষি ইত্যাদি মোট	১২৭৯৲
কর্ম্মকারকগণের বেতন মাসিক ৩৫৲ হিসাব	৪২০৲
ঐ জলপানি	৪৮৲
	১১৮৮০
(মোট লাভ)	১৫০০৲

কৃষ্ণকিশোর এই আয় ব্যয়ের তালিকা হর্ষপ্রফুল্ল নেত্রে মাতার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল,—"মা, তুমি এই গোশালা তৈরী করায়, শুধু যে গাঁয়ের লোকের দুধের কষ্ট কমেছে, তা নয়; আমাদের আয়ও দেড় হাজার টাকা বেড়ে গেছে।"

মাতা স্নেহ-দৃষ্টিতে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া কহিলেন,—"তুই যদি আরও একটু ভাল বন্দোবস্ত করতে পারিস্, কেষ্ট, তাহলে, এই গোশালার আয় আরও বাড়বে; দু' হাজার টাকারও বেশী হবে। এ বছর, ফল বিক্রি আর দুধের আয় থেকে কতকটা টাকা গোশালা তৈরীর জন্য খরচ করতে হ'য়েছে। আসছে বছর সে খরচটা বাঁচবে। তারপর আরও দু এক বছর বাদে আমরা মাঝে মাঝে গাই আর বলদ বিক্রি করতে পারবো; তাতে আরও

একটা আয় হ'বে। আর তুই যদি, এর পরে নিজে আট দশটা বলদ পুষে ধান আর অন্য অন্য ফসল আবাদের বন্দোবস্ত করিস, তাহলে একদিকে আবাদের জন্তে যেমন সারের অভাব হ'বে না, অন্তদিকে গরুর খাবার জন্তে বিচালিরও অভাব থাকবে না। আবার শুনেছি, ধান কাটার পর সেই ক্ষেতে খেঁসারি বুন্‌লে খুব খেঁসারি পাওয়া যায়। খেঁসারির লতা আর খেঁসারির ডাল দুধল গাইদের বড় ভাল খাবার। ঐ ডাল সিদ্ধ করে খাওয়াতে পারলে গাইদের দুধ অনেক বেড়ে যায়। তাতে একদিকে যেমন দুধ বিক্রির আয় বাড়বে, অন্তদিকে গরুর খাবার খরচও অনেক কমে যাবে।"

কৃষ্ণকিশোর মাতার বাক্যের সারবত্তা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিল; তথাপি বালকসুলভ দুষ্টামী দেখাইয়া গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল,—"কিন্তু মা, গোপালন করা, গরু বিক্রি করা, চাষ করা কি আমাদের মত ভদ্র লোকের কায?"

মাতার স্বর্ণাভ ললাট তলে তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নদ্বয় দুইটা কোহিনূরের ন্যায় জল্ জল্ করিয়া জলিয়া উঠিল; তিনি পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিলেন,—"তোর মতে আমাদের মত ভদ্রলোকের কাযটা কি শুনি?"

মাতার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর দৃষ্টি কৃষ্ণকিশোরের মনের মধ্যে একটা শঙ্কার তরঙ্গ তুলিয়াছিল; সে ভয়ে ভয়ে বলিল,—"এই যর, যাদের জমীদারী আছে, তারা নায়েব গমস্তার] হিসাব পত্র দেখবে, আর যাদের জমীদারী নেই, কেবল বিদ্যা আছে, তারা

ভাল ভাল চাকরী করবে—কেউ ডেপুটী বাবু, কেউ মুন্সেফ বাবু, কেউ বা কেরাণী বাবু হ'বে।"

মাতা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"তুই কি বলিস্ কেষ্ট? চাকরী? চাকরীটাই কি শুধু ভদ্রলোকের কায? কেরাণীগিরি ক'রে লোকে ভদ্রলোক থাকতে পারে, আর তুই চাষ করে গোপালন করে ভদ্রলোক থাক্‌তে পারবিনে? শুনেছিস্ ত্রেতা যুগে রাজর্ষি জনক আপন হাতে লাঙ্গল ধরে ভূমি কর্ষণ করতেন; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলভদ্র হলচালনা করে হলধর নাম পেয়েছিলেন। তাঁরা কি ভদ্রলোক ছিলেন না? আমরা তাঁদের কাছ থেকে ভদ্রতা শিখবো, না এই কলিকালে যারা গোলামী করে খায়, তাদের কাছ থেকে ভদ্রতা শিখ্‌বো? আর গোপালন? তুই কি ভুলে গেলি যে মুসলমানদের গুরুর গুরু হজরত মহম্মদ ভেড়া চরাতেন; আর আমাদের গুরুর গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছেলেবেলা পাঁচন হাতে নিয়ে সামান্য রাখালের কায করতেন। মহম্মদ যা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, আমার গর্ভের সন্তান হ'য়ে, সে কায করতে তুই কখনও লজ্জা করিসনে কেষ্ট।"

মাতার প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"আমি তোমার ত্রেতা যুগের জনকরাজার কথাও বুঝিনে, আর দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের কথাও বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি যে তুমি মা, তুমি যে কায করবে বা আমাকে করতে বলবে, তা করতে আমার কখনও লজ্জা হবে না।"

মাতা সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রের মস্তক আপন ক্রোড়ের নিকট

টানিয়া লইয়া তাহাতে আপন আশীর্ব্বাদ-সিক্ত কোমল করতল বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তুই আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিস্,—ভদ্রলোকের পক্ষে গরু বিক্রি করা উচিত কিনা? আমার মতে এখনকার দিনে আমরা যে জিনিষ পয়সা দিয়ে কিনি, তা অন্যকে দেবার সময় পয়সা না নিলে পয়সার অপব্যবহার করা হয়। সেকালে বামুনদের প্রতি লোকের ভারি ভক্তি ছিল, তাই ভাল গরুটি বামুনকে দান করত। ব্রাহ্মণরাও পাওয়া জিনিষটা বিক্রি করতেন না। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতিরা সেকালে গরু বিক্রি করতেন কি না তা আমি ঠিক জানি নে। ক্ষত্রিয়েরা গরু কিনতেন কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু তাঁরা যে গরু চুরি করতেন একথা মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব পড়লে জানতে পারা যায়।"

কৃষ্ণকিশোর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি কি আমাকেও সেকালের ক্ষেত্রী হ'তে বল'?"

মাতাও হাসিলেন। বলিলেন,—"না, তোকে আমি গরু চুরি করতে বলিনে। তোকে কি করতে বলি, শোন। তোর এখন উনিশ বছর বয়স হয়েছে। এখন তুই সাবালক হ'য়েছিস্, তুই এখন নিজের জমীদারী আর নিজের সব কায দেখ্। সাপুরের প্রজারা কিছু বেশী খাজানা দেওয়ায়, আর কতকগুলা পতিত জমীতে নূতন প্রজা বসায়, তার উপর গোশালা থেকে একটা আয় হওয়ায়, তোর জমীদারীর আয় এখন বছরে দশ হাজার টাকার বেশী হ'য়েছে। তার উপর দু' টা গোলায় আর দু'শ মণ

ধান জমেছে। আর তোর জন্যে ব্যাঙ্কে'ও পচিশ হাজার টাকা জমিয়েছি। তুই এই সব দেখে শুনে নে।

কৃষ্ণকিশোর, ভবিষ্যতে জমীদারীর ভার স্কন্ধে পড়িবে, ইহা ভাবিয়া বিশেষ ভীত হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে কহিল,—"মা তুমি যেন মনে করো না যে আমি এ সকল কাযের ভার নিতে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু তুমি, মা, আরও কিছুদিন ধরে আরও টাকা আরও ধান জমাও; জমিয়ে আমাকে একবারে 'ধনধান্য সমন্বিত করে ফেল। আর এদিকে আমি তত দিন আরও কিছু লেখা পড়া শিখে নিই।"

মাতা কহিলেন,—"তোর লেখাপড়া শেখায় আমি বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্, লেখাপড়া শেখাটা শেষ কায নয়, ওটা একটা নির্দোষ আমোদ আর মানসিক ব্যায়াম মাত্র। তুই জমীদারের ছেলে; তোর যথার্থ কায হচ্ছে, তোর প্রজারা খেতে পেলে কি না দেখা; আর তারা যাতে যথেষ্ট খেতে পায়, তার উপায় করে দেওয়া। আমাদের দেশে খাওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে, গোপালন আর কৃষিকাজ। তুই তাদিকে এই দু'টা কায শেখাবি;—শুধু মুখে বলে নয়, নিজে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে।"

কৃষ্ণকিশোর মনে মনে স্থির করিয়া লইল যে, মাতার উপদেশমত চিরদিন সে আপনাকে গোপালন ও কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবে; কিন্তু মুখে সে একটি কথাও কহিল না; কেবল [illegible] প্রদ্ধাতে তাহার সরলতাময় নয়নযুগল পূর্ণ করিয়া মাতার [illegible] চাহিয়া রহিল।—কি ভয়ঙ্কর অনাধুনিক পুত্র!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোয়ালিনী।

আমাদের অন্যায় হইয়াছে। আমরা নির্ব্বোধ ইঞ্জিনিয়র বাবুর কথায় এবং অকিঞ্চিৎকর গোশালার অকথায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়ের সুকথ্য কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

যখন ছোট বাবু মহাশয় আপন কুসুমদাম-পরিশোভিত বাগানবাটীতে বসিয়া ময়ূরপক্ষের ইন্দ্রধনু অপেক্ষা বিচিত্র শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এবং পার্শ্বচরগণের, দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত সুধা অপেক্ষা সুধাময়, বাক্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন হঠাৎ ছাদে উঠিয়া দেখিলেন যে ভ্রাতৃ-জায়ার খাসের বাগানে দুই চারিটি দুগ্ধবতী গাভী বৎসের সহিত যদৃচ্ছা বিচরণ করিতেছে। আরও কয়েক দিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করিলেন যে, তৃণক্ষেত্রবিচারিণী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে! ইহার কিছু দিন পরে তিনি আবার ছাদে উঠিয়া দেখিলেন যে, গাভী ও বৎসের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে; এবং তাহাদের মধ্যে কোনটি শ্যাম শাদ্বলে ঘুরিয়া সরস দূর্ব্বা চর্ব্বণ করিতেছে, কোনটি চূতবিটপীছায়ায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছে, কোনটি সরোবর সলিলপ্রান্তে নামিয়া

নির্ম্মল শীতল জল পান করিতেছে; কোন উদ্দাম নর্ত্তনশীল বৎস ফণিফণাসদৃশ পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া ছুটিতেছে, কোন পুষ্প-স্তূপসদৃশ বৎস বৃক্ষচ্ছায়ায় মাতার ক্রোড়ের নিকট শুইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বুঝি নন্দনের স্বপ্ন দেখিতেছে।

ছোটবাবু মহাশয় বাগানবাটীর ছাদ হইতে আরও দেখিলেন যে, তৃণ-উদ্যানে যে বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছিল, দুই জন ভৃত্য গাভীগণকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে রক্ষা করিতেছে। তিনি বুঝিলেন যে, বাগানবাটী প্রকৃতপক্ষে বাগানবাটী নহে, গোশালামাত্র। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এতগুলি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বড়বধূ ঠাকুরাণী কি করিবেন। এই পয়স্বিনী গাভী সকল প্রত্যহ নিশ্চয়ই চারি পাঁচ মন দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এত দুগ্ধ লইয়া লইয়া বিধবা বড়বধূঠাকুরাণী কি করিয়া থাকেন? ছোট বাবু মহাশয় বাল্যকালে গল্প শুনিয়া অবগত ছিলেন যে, পূর্ব্বকালে সৌখীন ব্যক্তিগণ আহারান্তে দুগ্ধে আচমন করিতেন। বড়বধূঠাকুরাণী একবারমাত্র আহার করেন; এক আহারের আচমনে চারিমণ দুগ্ধ খরচ হইতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর কলিকাতায় অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহার আহারও নাই, আচমন নাই। তবে এত দুধ কোথায় যায়? বড়বধূঠাকুরাণী কি সহসা অগস্ত্যঋষির ন্যায় তৃষ্ণাতুরা হইয়া পড়িলেন?—একটি মাত্র গণ্ডূষে পয়োনিধি সম পয়োরাশি পান করিয়া ফেলিতেছেন? অথবা চৌবাচ্ছার মধ্যে চারিমণ দুগ্ধ রাখিয়া তাহাতে স্নান করিয়া দেহলাবণ্য বর্দ্ধিত করিতেছেন?

তিনি শুনিয়াছিলেন যে ক্ষীরদা বিষ্ণুলোক হইতে নামিয়া ক্ষীর-সমুদ্রে অবগাহন করিতেন ;—বড়বধূঠাকুরাণী কি সেই কথা অবগত হইয়া, লক্ষীর অনুকরণ করিবার জন্য চারিমণ দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া তাহাতে ডুব দিতেছেন ? ছোটবাবু মহাশয় অনেক চিন্তা করিলেন বটে, কিন্তু একটা নিশ্চয়তায় উপনীত হইতে পারিলেন না।

কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে অনিশ্চিততায় অতিবাহিত করিতে হইল না। তাঁহার সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পার্শ্বচরগণ শীঘ্র তাহাকে সংবাদ আনিয়া দিল যে, বাগানবাটীর বড়গৃহিণী গ্রামের লোক-দিগকে দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছেন।

তাহা শুনিয়া একজন পার্শ্বচর কহিল,—"এতে কিন্তু আমার একটু বিশেষ উপকার হ'য়েছে। আগে জলা, বাসী, ননীতোলা দুধ, চার সেরের দরে, কিনতে হ'ত্তো ; তাও আবার সব সময় দরকার মত পাওয়া যেত না। এখন বড়গিন্নীঠাকৃরুণের গোশালার খাঁটি টাটকা দুধ টাকায় আট সেরের দর পাওয়া যায় ; তাই খেয়ে আমার আধমরা রোগা ছেলেটা এবাত্রায় বেঁচে গেছে ; এখন মোটাসোটা হ'য়ে হেসে খেলে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।"

অন্য এক জন রসিক পার্শ্বচর অঙ্গভঙ্গী-সহকারে রসের উদ্গার করিল,—

"গোয়ালিনীর দুগ্ধ খেয়ে ছেলে আমার গেল বেড়ে
সাত হাত লম্বা।

হেঁড়ে গলা এঁড়ে যেন ঝম্ফ দিয়ে তেড়ে এল
মুখে ডাকে হম্বা ॥'

শ্রীযুক্ত ছোট বাবু মহাশয় পার্শ্বচরের উৎকট রসিকতায় যোগদান করিতে পারিলেন না; তাঁহার কুলগৌরব তখন খর্ব্ব হইতেছিল, তখন কি তিনি হাসি তামাসাতে যোগদান করিতে পারেন? তিনি আপন ললাটতল তরঙ্গিত করিয়া, নয়নদ্বয় মধ্যাহ্ন আকাশের ন্যায় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—"বল কি? শেষ কালে এতটা অধঃপতন হ'ল? বড়বৌঠাকরুণ তাজপুর জমীদার বংশের—আমার বাপ পিতামহের বংশের—কুলবধূ হয়ে শেষকালে দুধ বিক্রি সুরু করলেন? কাঁকে কেঁড়ে নিয়ে গোয়ালিনী হ'লেন? লোক সমাজে আর আমাদের মুখ দেখাবার উপায় রাখলেন না? ছি! ছি! ছি!"

চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"ছি! ছি! ছি!'

একজন পার্শ্বচর টিপ্পনি করিলেন,—"আর শুনেছেন, ছোটবাবু মশাই, শুধু যে আমাদের বামুন কায়েত ভদ্রলোক-দেরই দুধ বিক্রি করেন তা'নয়। বড়গিন্নী ঠাকরুণের খদ্দের দলে বাগ্‌দীও আছে।'

ছোটবাবু মহাশয় কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"আর ব'লো না। আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

দিবাভাগে সেই কুৎসিত কথা, ছোটবাবু মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বন্ধ রহিল বটে, কিন্তু রাত্রে আহার কালে তিনি সেই নিদারুণ কথাটা আবার স্মরণ করিলেন। সমীপবর্ত্তিনী

তালবৃন্তসঞ্চালনকারিণী সহধর্ম্মিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“ওগো! শুনেছ? তোমার বাগান বাড়ীর বড় বা গোয়ালিনী হ'য়েছেন; কেঁড়ে কাঁকে ক'রে দুলে বাগ্দীদের দুধ বিক্রি করছেন। ছি! ছি! ছি! সমাজে আর আমাদের মুখ দেখাবার উপায় রাখলেন না।”

ছোটবঠাকুরাণী কখনও স্বামীর কথার কোনও প্রত্যুত্তর করিতেন না; এখনও করিলেন না।

বলা বাহুল্য, দেবরের এই 'ছি ছি ধ্বনি কৃষ্ণকিশোরের মাতার কর্ণে ধ্বনিত হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না।—দুগ্ধপানরত শিশুগণের হসিত মুখ স্মরণ করিয়া তিনি আপন মনোমধ্যে যে স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকনিন্দার তীক্ষ্ণতম বাণও প্রতিহত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহোৎসব।

খুল্লতাতের বৈঠকখানায় মাতার নিন্দা কীর্ত্তিত হয়, একথা কৃষ্ণকিশোরও অবগত ছিল। এজন্য ইদানিং কোনও অবকাশ উপলক্ষে সে তাজপুরে আসিলে, খুল্লতাতের ঐ বৈঠকখানায় যাইয়া সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত না।—যে স্থানে জননী নিন্দিতা হ'ন মাতৃভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পক্ষে সেস্থান নরক অপেক্ষা নিন্দনীয়।

কৃষ্ণকিশোর, খুল্লতাতপুত্র সমবয়স্ক রাধাকিশোরের সহিত, কলিকাতায় একই কলেজে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। এবং রাধাকিশোর শকট আরোহণ করিয়া কলেজে যাইবার সময় মাঝে মাঝে কৃষ্ণকিশোরের মেসবাটীর সম্মুখে গাড়ী রাখিয়া তাহাকে আপন গাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিত; কিন্তু এ চেষ্টাতে রাধাকিশোর কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।—কৃষ্ণকিশোর কোনও দিন বলিত, "এইটুকু পথ; এর জন্যে গাড়ী চড়তে হ'লে খোঁড়া হওয়া উচিত। কোনও দিন রাধাকিশোরের গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সে প্রস্থান করিত।—কৃষ্ণকিশোরের মাতা বলিয়া দিয়াছিলেন যে যাহার নিজের গাড়ী নাই, অন্যের গাড়ী চড়িয়া তাহার বাবুগিরি শিক্ষা করা উচিত

নহে। বিদ্যালয় হইতে বাটী ফিরিবার সময়ও সে রাধাকিশোরের সহিত একত্রে বাটী ফিরিত না। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বা অন্য কোনও স্থানেও তাহারা মিলিত হইত না। কৃষ্ণকিশোর ক্রীড়ক রূপে ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইত, রাধাকিশোর সেখানে দর্শকরূপে উপস্থিত হইত। কৃষ্ণকিশোর যাহাদের সহিত মিলিত হইত তাহারা বিদ্যাচর্চ্চা করিত; রাধাকিশোর যাহাদের সহিত মিলিত হইত, তাহাদের মধ্যে কেহ নবপরিণীত, কেহ সদ্য বিবাহিত হইবার আশায় আশান্বিত; তাহারা প্রেমরাজ্যের মনোমদ কাহিনী সকল কীর্ত্তিত করিতে ভাল বাসিত।

উল্লিখিত দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণ বশতঃ কৃষ্ণকিশোর রাধাকিশোর সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা অবগত হইতে পারে নাই। সে জানিত না যে কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে রাধাকিশোরের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

নানা কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তি নানা স্থান হইতে আশান্বিত হৃদয়ে ও লোলুপ নয়নে জমীদার পুত্র, সুন্দর ও বিদ্যারত রাধাকিশোরকে দেখিতে আসিতেন। রাধাকিশোর পিতার আহ্বানে কলিকাতা হইতে, প্রেমরাজ্যের চিত্তবিনোদন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, বাটী আসিত; এবং সযত্ন ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা আপন তরুণ গণ্ড চিকণ করিয়া সুগন্ধি সাবানের দ্বারা আপন বরদেহ বিধৌত করিয়া, গন্ধদ্রব্যের দ্বারা সিগারেটের গন্ধ ঢাকিয়া, সরল সৌদামিনীদীপ্তিতুল্য টেরি কাটিয়া, অঙ্গুলিতে উজ্জ্বল রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া, উৎকৃষ্ট মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কন্যাদায়-

গ্রস্থগণের নিকট আপনার প্রেমপ্রফুল্ল দেহ উপস্থিত করিত। কন্যাদায়গ্রস্থগণ পাত্রের কুমারকল্প দেহ গৌরব দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, রজত পাত্রে জলযোগ করিতেন; তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া আপনাদের মলিন অধর রক্তাক্ত করিতেন; সুগন্ধি তাম্রকুটের ধূমপান করিয়া কক্ষমধ্যে মেঘমালার সৃষ্টি করিতেন এবং পরিশেষে জমীদারকুলতিলক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লম্বা ফর্দ্দ দেখিয়া পরিতপ্ত হৃদয়ে চলিয়া যাইতেন;—রাধাকিশোরের পত্নীলাভের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় ভাবিতেন, কি আশ্চর্য্য! যে অধম ব্যক্তি আপন ঔরস জাতা কন্যার বিবাহে সামান্য দশ হাজার টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে কোন স্পর্দ্ধায় জমীদার পুত্রকে জামাতারূপে পাইবার প্রত্যাশা করে?

রাধাকিশোর নিভৃতে বসিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে ভাবিত, হায়, হায়! দশহাজার রজত মুদ্রার একটি থলি মাথায় করিয়া তাহার তরুণ হৃদয়রঙ্গমঞ্চে কখনও কি একটি বধূ আবির্ভূতা হইবে না? বিধাতা কি চিরদিন তাহাকে আইবুড় করিয়া রাখিবেন? সরস প্রেমের অভাবে তাহার হৃদয় কি চিরদিন শ্মশান হইয়া থাকিবে? আপন প্রবরমূর্ত্তি দেখাইবার প্রয়াস ও পরিশ্রম চিরকাল কি তাহার বিফলেই যাইবে? বোধহয় পিতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহাকে চিরকাল অবিবাহিতই থাকিতে হইবে। 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।' রাধাকিশোর কিন্তু লোকবাসিনী বিষ্ণুর উৎসঙ্গ-

শায়িনী লক্ষ্মী চাহে না; কিন্তু উদ্যোগী হইলে সে কি একটি নোলকপরা পার্থিব লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারিবে না? কন্যার জনকগণ পিতার ধনুকভাঙ্গা বা মেরুদণ্ড ভাঙ্গা পণের কথা শুনিয়া যখন একটির পর একটি চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন রাধাকিশোর বিষণ্ণ হইতে বিষণ্ণতর হইল; এবং কি আমানুষিক উদ্যোগের দ্বারা একটি পত্নী লাভ করিতে পারিবে তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল।

জমীদার গৃহিণী পুত্রের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তাহার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যদি অবিলম্বে বাটীতে একটি বধূ লইয়া না আসেন পুত্র নিজেই বোধহয় একটি বধূ অথবা অভাব পক্ষে একটি উপবধূ সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হইবে। তিনি কখনই স্বামীর কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না; কিন্তু বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে স্বামীকে সকল কথা বুঝাইয়া না বলিলে, ভবিষ্যতে পুত্রের মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব। অতএব তিনি সুযোগ বুঝিয়া স্বামীর নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিলেন।

গৃহিণীর নিকট পুত্রের মনস্তত্ত্বের সংবাদ পাইয়া ছোটবাবু মহাশয় কিছু বিচলিত হইলেন। পুত্রের বিবাহের যৌতুকটা পাছে একবারে হাত ছাড়া হইয়া যায় তাহার জন্য কিছু আশঙ্কিত হইলেন। কহিলেন,—"দেখ, গিন্নি, আমি ত তেমন বেশী কিছু চাইনি। দশহাজার টাকাও যদি কেউ দিতে না পারে, তাহলে কেমন করে ছেলের বিয়ে দিই বল দেখি? আমি ছ' হাজার

টাকা নগদ চেয়েছি ; আর চার হাজার টাকায় বরাভরণ আর কন্যার অলঙ্কার চেয়েছি। এটা কি বড্ড বেশী হ'য়েছে ?"

গৃহিণী কহিলেন,—"নগদ টাকাটা কিছু বেশী চাওয়া হ'য়েছে।"

ছোট বাবু মহাশয় বুঝাইয়া বলিলেন,—"আমার মত একজন জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র—বড় ছেলে! তার বিয়েতে একটু খরচ পত্র করতে না পারলে লোকে যে আমার গায়ে ধূলা দেবে। আমি ভেবে দেখেছি, ঐ ছ' হাজার টাকা খরচ করতে না পারলে, আমি একটু ধূমধাম দেখিয়ে আত্মীয় স্বজনকে পরিতুষ্ট করতে পারব না। আর ছেলের বিয়েতে ঘরথেকেও টাকা বার করে খরচ করবো না।"

গৃহিণী জমীদারের উচ্চ ও উদার ও বংশমর্য্যাদাপূর্ণ হৃদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কহিলেন,—"দেখ, যাঁর মেয়ে তোমার পুত্রবধূ হ'বে আর তোমার সব আদর ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে, তিনি ত তোমার কম আত্মীয় স্বজন নন; তাঁকেও পরিতুষ্ট করাত তোমার উচিত। এই বিয়েতে ধূমধাম কিছু কম করে, তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকাটা যদি কিছু কম নাও, তাহ'লে তোমার সব চেয়ে বড় আত্মীয়কে পরিতুষ্ট করা হবে। আর এবার যে ইঞ্জিনিয়র বাবুর মেয়ের সঙ্গে রাধাকিশোরের বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে, তুমিই ত বলেছ, তেমন সুন্দরী আর শান্ত শিষ্ট মেয়ে দশখান গ্রাম খুজলেও পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছে তুমি নগদ টাকাটা কিছু কম নিয়ে সেই খানেই ছেলের বিয়ে দাও।"

যাহার দুর্গোৎসবের খ্যাতি অর্দ্ধ বঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল তাঁহারই গৃহিণীর অসীম নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া ছোটবাবু মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন; তথাপি তিনি গৃহিণীকে আবার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কহিলেন,—"তুমি একটুও বুঝলে না। আমার বড় ছেলের বিয়ে, আমার বাড়ীতে এই প্রথম কায, এতে একটু ধূমধাম না করলে কি চলে? তারপর, লোকটা ইঞ্জিনিয়র; প্রায় হাজার টাকা মাহিনা পায়; তার উপর—বুঝলে?—এই কণ্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে দু'হাতে টাকা লুট করে। একটু মোড় দিলে—বুঝলে?—তার কাছ থেকে অনায়াসেই নগদ ঐ ছ' হাজার টাকাই পাওয়া যেত। কিন্তু তুমি যখন বুঝলে না, আর বলছ, ছেলেও অধৈর্য্য হ'য়েছে, তখন আমাকে কিছু কম টাকাতেই রাজি হ'তে হবে।"

অতএব তিনি যখন ইঞ্জিনিয়র বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানিলেন যে তিনি কোনও ক্রমেই নগদ দুই হাজার টাকার বেশী দিতে পারিবেন না, তখন ছোটবাবু মহাশয় তাঁহার পার্শ্বচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জমীদারীছন্দে দীর্ঘ প্রত্যুত্তর লিখিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবুকে অবগত করিলেন যে, সক্ষম ও রোজগারী পুরুষ হইয়াও তিনি যখন আপন ঔরস জাত কন্যাকে সামান্য ছয় হাজার টাকা দিতে কাতর তখন, অগত্যা ভাবী কুটুম্বের খাতিরে নগদ ছয় হাজার টাকার স্থলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র লইয়াই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত। ছোটবাবু মহাশয় আরও লিখিলেন, যে আগামী বৈশাখ মাসের

মধ্যেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; অতএব সত্বর দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা শেষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

এই পত্র লিখনের পর, ছোটবাবু মহাশয় প্রায় পক্ষ কাল অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সক্ষম ও রোজগারী ইঞ্জিনিয়র বাবু সে পত্রের কোনও উত্তরই প্রদান করিলেন না।

তখন তিনি গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নূতন পাত্রীটি ইঞ্জিনিয়র বাবুর কন্যার ন্যায় সুন্দরী না হউক কিন্তু একবারে বিশ্রী নহে—বর্ণ গৌর, এবং মুখশ্রীও মন্দ নহে; তবে কন্যার বয়স বোধহয় পনের বৎসরের অধিক হইয়াছিল। তা হউক, রাধাকিশোর যে যৌবন সাগরেই সাঁতার দিতে চায়। পাত্রীর পিতা বয়োধিকা কন্যার জন্য রাধাকিশোরে ন্যায় পাত্র লাভ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলেন; এবং নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে দশ হাজার টাকাই ছোটবাবু মহাশয়ের পদপ্রান্তে ঢালিয়া মনে করিলেন যে তাঁহার আদরিণী কন্যা কত সুখে সুখিনী হইয়া জমীদার গৃহের গৃহিণী হইবে।

জমীদার বাটীতে বিবাহোৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। গাত্র হরিদ্রা ও বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। রাজমিস্ত্রি, ছুতর, রংওয়ালা আসিয়া, দিন রাত পরিশ্রম করিয়া, গৃহটি সুসংস্কৃত করিল; তাহা নবনির্ম্মিত গৃহের ন্যায় আপন ঔজ্জ্বল্যে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ধ্বজ, পত্র ও পুষ্প মণ্ডিত নহবৎ খানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল; কুটম্ব ও কুটম্বিনীগণ সমাগত হইলেন। নাচ, বাজা, বাজী

প্রভৃতির সমারোহ বন্দোবস্ত হইল। হাস্যে, কৌতুকে, আহারে বিহারে, গানে, বাজনায় সমস্ত গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল।

রাধাকিশোরের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল; বধূ আসিয়া চরণালঙ্কারের নিক্কণে স্বর্ণাভরণের শিঞ্জিতে, কৌষেয় বস্ত্রের খস্‌খসানিতে তাহার প্রেমে জর জর জীবন সার্থক করিল—হতাশ মজ্জমান ব্যক্তি যেন সহসা পুষ্পাকীর্ণ তীরভূমি পাইয়া জীবন লাভ করিল। তাহার পর, হঠাৎ একদিন ছোটবাবু মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার সুখময় উৎসব-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তিনি জাগ্রত পৃথিবীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জীবন্ত পাওনাদারগণ হাঁ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মাতার উপদেশ।

বি, এ, পরীক্ষার পর বাটী আসিয়া কৃষ্ণকিশোর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মাতার নিকট শ্রবণ করিল যে, আর সাত দিন পরেই রাধাকিশোরের বিবাহ হইবে। আরও শুনিল যে, তাহার খুড়ী-মা নিজে আসিয়া তাহাকে বিবাহ বাড়ীতে যাইবার জন্ত বলিয়া গিয়াছেন। অতএব সে মাতার অনুমতি পাইয়া, কয়েক-দিন খুল্লতাতের বাটীতে থাকিয়া বিবাহোৎসবে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বড় বধূঠাকুরাণী কখনও কোনও উৎসবে যোগদেন নাই। রাধাকিশোরের বিবাহেও তিনি উৎসবালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। কেবল একদিন যাইয়া একটি স্বর্ণালঙ্কার উপহার দিয়া নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

দ্বাদশদিবসব্যাপী উৎসবের পর কৃষ্ণকিশোর বাটী ফিরিয়া একদিন নিভৃতে মাতাকে কহিল,—"মা, আমার মনে হয়, ঠিক পরীক্ষার সময়ই রাধাকিশোরের বিয়ের উদ্যোগ করা ভাল হয়নি? যার দেশের বাড়ীতে বিয়ের উদ্যোগ চলে, তার কলকাতার বাসায় পরীক্ষার পড়া চলে না। যদি রাধাকিশোর এবার বি, এ, পরীক্ষায় পাশ হ'তে না পারে, তাহলে, আমি বলব, কাকাবাবুই তার এই অনিষ্টটা করলেন।"

মাতা বিষণ্ণ মুখে কহিলেন,—"লেখাপড়ার ক্ষতি ছাড়া তোর কাকাবাবু নিজের ছেলেদের আরও অনেক অনিষ্ট করেছেন। তুই জানিস্‌নে, তোর কাকাবাবু পূজাপার্ব্বণে ধুমধাম করে আর অন্য রকম বাজে খরচ করে আগেই ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন; তারপর এই বিয়েতে যে ছ' হাজার টাকা নগদ পেয়েছিলেন, তার উপর আরও দু' তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে বিয়ের খরচ চালিয়েছেন। এক দিকে যেমন ছেলেদের বাবুগিরি শেখাচ্ছেন, অন্যদিকে তাদের বাবুগিরি করবার কোন উপায়ই রাখছেন না। আমার ভাবনা হয়, ছেলেগুলো এর পর বড় কষ্টে পড়বে।"

খুল্লতাত পুত্রগণের বিশেষতঃ তাহার সমবয়স্ক রাধাকিশোরের ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কথা ভাবিয়া কৃষ্ণকিশোরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল। সে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, তাহার পর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কাকাবাবুকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল না কেন?"

মাতা পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ মুখে কহিলেন,—"আমি দু' একবার সৎপরামর্শ দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুরপো সম্পত্তি বিভাগের পর থেকে আর আমাদিকে আপনার লোক মনে করেন না; মনে করেন আমরা তাঁর শত্রুপক্ষ। আমরা কোনও সৎপরামর্শ দিতে গেলে, মনে করেন যে আমরা তাঁর শত্রুতা করছি। তাঁর বৈঠকখানায় কতকগুলি লোক জুটেছে; তারা যে শুধু তাঁর বাড়ীতে ভাল ভাল খাবার জিনিষই খাচ্ছে,

তা নয়; তাঁর মাথাটিও বেশ করে খাচ্ছে। তারা যা বলে তিনি তাই বেদবাক্য মনে করেন। দুর্গাপূজারসময় তাদের পরামর্শে তিনি যে বাড়াবাড়িটা আরম্ভ করেছেন, তার জন্যে তাঁর দু' রকম অনিষ্ট হচ্ছে। একদিকে তাঁর ঋণের পরিমাণ প্রত্যেক বছরেই বাড়ছে। তারপর, অন্যদিকে, ঐ দুষ্ট লোকগুলোর কথা শুনে তিনি প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে বছর বছর ঠাকুরপ্রণামী বাবদ কিছু কিছু আদায় করেন। তাতে প্রজারা সব অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। দু'চার জন প্রজা তাঁর মহল ছেড়ে আমাদের মহলে এসে বাস করছে; এতে তাঁর আয়ও কিছু কিছু কমে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণকিশোর চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, মা, কাকাবাবু ত অবুঝ ন'ন, আর তাঁর স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল; তবে তিনি এমন সব কায করে নিজের আর নিজের ছেলেদের অনিষ্ট করছেন কেন?'

মাতা কহিলেন,—"করছেন কেন, শুনবি কেষ্ট? মানুষের পক্ষে যশের লোভটা বড় ভয়ানক লোভ! যশের লোভে যদি আমরা ভাল কাযও করি, তাহলে তারও ফলটা মন্দই হয়। আর যশের লোভে অবিবেচনার কায করলে তার ফল ত মন্দ হবেই। তোর কাকা বাবু ঐ দুষ্ট লোকগুলোর মিথ্যাকথা গুলোকে সত্য খ্যাতি মনে করেন; আর সেই খ্যাতিলাভের লোভে অজ্ঞান হ'য়ে, ক্ষমতার চেয়ে বেশী খরচ করে ফেলেন। তার পর অবশ্য বেশী খরচের জন্য তাঁর মনে একটা অনুতাপ আসে। মানুষের জীবনটাকে সুখভোগ্য করবার জন্যে মাঝে মাঝে এক

একটা আনন্দোৎসবের দরকার আছে বটে; কিন্তু আমার মতে সেটা মোটেই আনন্দোৎসব নয়, যাতে পরে অনুতাপ আনে; আনন্দোৎসবের ফল আনন্দ, অনুতাপ নয়। তোর বাবাও দুর্গোৎসব করতেন, আর তাতে আমরা সব বাড়ীর লোক মিলে কায করতাম; কত আত্মীয় কুটুম্ব কত গ্রামের লোক এসে যোগ দিত; গরীব প্রজারা দলে দলে খেতে আস্‌ত; আমাদের কত আনন্দ হ'ত। কিন্তু তিনি ধার ক'রে বা প্রজাদের কাছ থেকে ঠাকুরপ্রণামী আদায় করে দুর্গোৎসব করতেন না। কাযেই আমাদের আমোদটা আমোদই থেকে যেত। এর পর তুইও দুর্গোৎসব করিস্। কিন্তু তুই আমার কথা মনে রাখিস; কখনও কোনও গরীব লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বা ক্ষমতার চেয়ে বেশী খরচ করে যশোলাভ করতে চেষ্টা করিস্ নে। রাধাকিশোরের মত না হ'ক, তোর বিয়েতেও আমি ঘটা করবো; কিন্তু কখনও যৌতুক আদায় করে বা ধার করে খরচ করবো না।"

সহসা আপন বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়ায় কৃষ্ণকিশোরের মনের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই গোলযোগের কারণটা আমরা পরবর্ত্তী তিনটি পৃথক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব; মাতার উপদেশের মধ্যে আমরা সেই গোলযোগটা উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রাখি না।

পুত্রকে নীরব দেখিয়া মাতা কহিলেন,—"কি ভাবছিস্, কেষ্ট?"

কৃষ্ণকিশোর কিছু বিচলিত হইয়া কহিল,—"কই, কিছু ত ভাবিনি, মা।"

মাতা হাসিয়া কহিলেন,—"না, তোর ভাবনার কোনও কারণ নেই, তুমি মনে করিস্‌নে যে আমি তোর বউকে কম গহনা দেব। আর তুই যদি যশের আকাঙ্ক্ষা না করে কেবল কর্ত্তব্য বোধে খরচ করিস্, তোর কখনই কোন ভাবনার কারণ থাকবে না। পৃথিবীর লোকের মুখের যশটাকে তুই প্রাণপণ শক্তিতে অবজ্ঞার চোখে দেখিস্।"

মাতার শেষ উপদেশকথাগুলি কৃষ্ণকিশোরের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছাদে—জ্যোৎস্নালোকে।

মাতার উপদেশ শ্রবণ কালে বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে কৃষ্ণকিশোরের মনের মধ্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা তোমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে তিনটি পরিচ্ছেদে উহার কারণ নির্ণয় করিব। এক্ষণে তাহাই করিতেছি।

তখন বি, এ, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, এজন্য কৃষ্ণ-কিশোরের মস্তক গুয়নের অবসর ছিল না। সে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিত এবং কাল্পনিক প্রশ্ন সকল রচনা করিয়া তাহার উত্তর লিখিত; কখনও অধ্যাপকগণের নিকট যাইয়া কোনও দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইত; কখনও মেসের সহপাঠীর নিকট কোনও দুর্ব্বোধ পাঠাংশের মীমাংসা করিয়া লইত; কখনও অন্য মেসের বুদ্ধিমান ছাত্রদিগের নিকট যাইয়া একত্রে অঙ্ক-শাস্ত্রের আলোচনা করিত।

এই রূপে অঙ্কের আলোচনা করিবার জন্য কৃষ্ণকিশোর একদিন সন্ধ্যাকালে অন্য একটি মেসে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে উমাপদ নামক তাঁহার এক সতীর্থ বন্ধু বাস করিত। ঐ মেসবাটীর ত্রিতলে ও দ্বিতলে উঠিবার অধিরোহিণীর পার্শ্বে

রন্ধনশালা। রন্ধনশালায় বামুন ঠাকুর ছাত্রগণের সান্ধ্যভোজনের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল। সে কৃষ্ণকিশোরকে উপরে উঠিতে দেখিয়া কহিল,—"বাবুরা কেউ বাড়ীতে নেই। তাঁরা সবাই গড়ের মাঠে ক্রীকেটের ম্যাচ্ দেখ্‌তে গেছেন। সেখানে আজ হরতুকী বাগানের সঙ্গে টাউন ক্লাবের ম্যাচ্ হচ্ছে। আপনি দেখ্‌তে যান নি?"

কৃষ্ণকিশোর সংক্ষেপে কহিল—"না।" সে কখনই কোনও ক্রীড়া দেখিতে যাইত না। ইহাতে তোমরা যেন মনে করিও না যে ঐ সকল ক্রীড়াতে তাহার পারদর্শিতা ছিল না। তাহার অপরিমিত শারীরিক বল থাকায়, সে সকল প্রকার শারীরিক ক্রীড়ায় এবং ভ্রমণে, লম্ফনে, সন্তরণে, ধাবনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। এবং আমরা পরে দেখিব, লম্ফনের বিশেষ শক্তি লইয়া সে কিরূপে কয়েক সপ্তাহ পরে আপনার ও অন্যের কি মহা উপকার সংসাধন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ক্রীড়াতে যোগদান করিয়া সে ক্রীড়ক হইতেই ভাল-বাসিত; তাহার দর্শক হইয়া ক্ষণিক মানসিক উত্তেজনা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিত না।

কৃষ্ণকিশোর বামুন ঠাকুরের কথা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইল। ভাবিল, বালকগণের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় সে সেই ছাত্রাবাসে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে, না, আপন আবাসে ফিরিয়া গ্যাসের আলোক জ্বালিয়া নির্জ্জনে অঙ্ক পাঠে মনোনিবেশ করিবে? সে ভাবিয়া স্থির করিল যে, সেই দিন সে সারাদিনমান

বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছে, অতএব এই সন্ধ্যাকালে এই বাটীতেই উমাপদের অপেক্ষায় অল্পকালের জন্য বিশ্রামে অতিবাহিত করিলে কোনও ক্ষতি হইবে না।

কৃষ্ণকিশোরের ছাত্রবন্ধু শ্রীমান উমাপদ বসু বাটীর ত্রিতলের একটি কক্ষে অন্য দুইজন ছাত্রের সহিত একত্রে বাস করিত। কৃষ্ণকিশোর সন্ধ্যাতিমিরাচ্ছন্ন অরঘট্টঘাটিকাসদৃশ অধিরোহিণী শ্রেণী কষ্টে আরোহণ করিয়া বন্ধুর অন্ধকারময় কক্ষে উপনীত হইল। সেখানে তিনটি ছাত্রের তিনটি মসীতিলকাঙ্কিত চিরবিস্তৃত শয্যা উদারহৃদয় আশ্রয়দাতার হৃদয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; এবং তাহা বালিশরূপ বাহু প্রসারিত করিয়া যেন রণক্লান্ত কতকগুলি বিভিন্ন আকারের পুস্তককে বক্ষে স্থান দান করিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর বন্ধুর শয্যাটি চিনিত; সে কতকগুলি পুস্তককে আশ্রয়চ্যুত করিয়া, তাহাতে উপবেশনের স্থান করিয়া লইল।

তখন চৈত্রমাস আগত হইয়াছিল, এবং বৃষ্টিপাতের অভাবে বিলক্ষণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল। তাহার উপর কক্ষটিতে পবন প্রবেশের সবিশেষ ব্যবস্থা না থাকায়; এবং তন্মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ায় কৃষ্ণকিশোরের যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে মনে করিল যে, হয়ত গৃহচ্ছাদে সন্ধ্যাকালীন শীতল দক্ষিণ মারুত প্রবাহিত হইতেছে; সেই স্থানে যাইয়া বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিলে সে যথেষ্ট স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে পারিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা সে পূর্ব্বে কখনই জানিতে পারে

নাই ; তাহা জানিলে, গৃহছাদে উঠিবার অভিলাষ কখনই তাহার মনোমধ্যে উদিত হইত না।

সেই বিশেষ কথাটা এই। গৃহাধিকারী যে ভদ্রব্যক্তি ছাত্রাবাসের জন্ত ঐ গৃহ ছাত্রগণকে ভাড়া দিয়াছিলেন, তিনি পারিপার্শ্বিক গৃহস্থগণের অসুবিধার কথা চিন্তা করিতেন। যুবকগণ গৃহছাদে উঠিয়া, কখনও অসংযত সঙ্গীতের দ্বারা, কখনও উচ্চ কলহাস্যের দ্বারা, কখনও বা আপনাদিগের নিরর্থক তর্কাহব দ্বারা পাছে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থগণের বিরক্তি উৎপাদন করে, অথবা পাছে তাহারা গৃহকর্ম্মরতা, ছাদোত্থিতা লজ্জাসঙ্কুচিতা কুলকামিনীগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের ত্রস্ত হৃদয় মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে, এজন্ত তিনি বাটী ভাড়া দিবার সময় বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন যে কোন ছাত্র কোনও কারণে কখনই ছাদে উঠিতে পারিবে না। এজন্য ঐ ছাত্রাবাসের কোনও ছাত্রই ছাদে উঠিত না ; এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থের সরমাগণ নিঃশঙ্কায় আপন আপন ছাদে উঠিতে পারিতেন।

কৃষ্ণকিশোর এই নিষেধের কথা অনবগত থাকিয়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে ছাদে উঠিয়াছিল। সেখানে উন্মুক্ত আকাশের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া তাহার গ্রীষ্মতপ্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল।

কিয়ৎ কাল মধ্যে শুক্লা ত্রয়োদশীর তারানাথ দূরবর্ত্তী এক গৃহচূড়া অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশপথে দেখা দিল ; বিধাতা যেন সালঙ্কৃতা শর্ব্বরীর ললাটপটে স্বর্ণ টিপ পরাইয়া দিলেন ;

স্বর্গের দেবতার মণিময় মুকুটের মধ্যমণি যেন জ্বলিয়া উঠিল; স্বর্গের নীলসরোবরে দীপ্তিময় কুমুদ কল্হার মধ্যে যেন দীপ্তিময় শ্বেতশতদল ফুটিয়া উঠিল।—দেবতারা কৃষ্ণকিশোরের সর্ব্বাঙ্গে যেন স্বর্গীয় হর্ষ ছড়াইয়া দিলেন।

এই ছাত্রাবাসের সম্মুখভাগে পশ্চিমদিকে বড় রাস্তা। ইহার অন্যপার্শ্বে দক্ষিণ দিকে একটি অপরিসর গলি রাস্তা। এই গলিরাস্তার অপর পারে আরও কিছু দক্ষিণে কোনও ভদ্রলোকের একটি ত্রিতল বাটী ছিল। ঐ ত্রিতলবাটীর ছাদের এক পার্শ্বে বোধহয় রাজমিস্ত্রিদের আবশ্যক কয়েকটা বংশখণ্ড এবং চুর্ণলিপ্ত কয়েকটা টিনের পাত্র পতিত ছিল। কৃষ্ণকিশোর মুগ্ধনেত্রে দেখিল ঐ সামান্য বংশদণ্ডগুলির উপর এবং ঐ সামান্য পাত্র গুলির উপর নিশানাথের কৃপাদৃষ্টি পতিত হওয়ায় তাহা রজতময় হইয়া গিয়াছে।

ধীরে, ধীরে, ধীরে, যেন নীরব পাদক্ষেপে নক্ষত্র মালিকা চন্দ্রতিলকা তমস্বিনী অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; তাঁহার অপূর্ব্ব রূপের প্রভায় যেন ঐ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ছাদটি ভরিয়া গেল। জ্যোৎস্নাদেবী যেন মলয়ানিল সেবন লালসায় ঐ ছাদের উপর রজত অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। বসন্তের ইঙ্গিতে দেব সমীরণ আরও শীতল ভাবে প্রবাহিত হইলেন। রজনীকান্ত ব্যোমমার্গে আরও একটু উর্দ্ধে উঠিলেন। বিলাসিনী রজনীর অঙ্গ যেন, নবীনা প্রেমরঙ্গিনীর অঙ্গের ন্যায়, শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত ও জ্যোৎস্না কৃষ্ণকিশোরের তরুণ মনে এক নূতন

আনন্দ আনিয়া দিল। সে আসন্ন পরীক্ষার কথা, দুরূহ গণিত সমাধানের কথা ছাত্রবন্ধুর কথা সমস্তই ভুলিয়া গেল। সে সমস্ত ভুলিয়া প্রকৃতির এই মধুময়ী আলোকময়ী মাধুরিমা অবলোকন করিল। তাহার বিহ্বল নয়নদ্বয় চন্দ্রালোকের উন্মাদনাপূর্ণ মধুরতা যেন আকণ্ঠ পান করিয়া ফেলিল।

তাহার পর?

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিতে হইলে, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ পার্শ্বের বাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লিপি-বদ্ধ করা প্রয়োজন। আমরা এই প্রয়োজনীয় কার্য্যটা ক্রমে সম্পন্ন করিব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তরুণী।

দক্ষিণ দিকের ঐ ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটীতে এক তরুণী জনক জননী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সহ বাস করিত। তরুণীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, বুঝিবা তাহার তরুণ হৃদয়-তটে যৌবনতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তথাপি তাহার পিতা মাতা তাহাকে একটি সৎপাত্রে পাত্রস্থ করিতে পারেন নাই।

পিতা বর্ত্তমানে কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দেওয়া পিতারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মাতার নহে। সেই কর্ত্তব্য পথ মাতা বার বার অকর্ত্তব্যপরায়ণ পিতাকে দেখাইয়া দিতেন; কিন্তু পিতা সে পথে চলিতেন না। তিনি সরকারি কার্য্যে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন; সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি এমন একটু অবসর পাইতেন না যে, সমাগতযৌবনা কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র খুঁজিয়া বাহির করেন।

সত্বর একটি সৎপাত্রে পতিত হইবার জন্য কিশোরী কন্যা যে বিশেষ অধীরা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার সদাসস্মিত মুখ দেখিয়া বা তাহার ক্রীড়াশীল কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি না। কিন্তু কন্যার সৎপাত্রের সন্ধান করিতে না পারায় কন্যার জননী অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার স্বামীকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অলস বলিয়া

বুঝিয়াছিলেন ; কিন্তু যে স্বামী অলস ও অকর্ম্মণ্য, তিনি তাঁহাকে অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন নাই। দণ্ডায়মানে, উপবেশনে, শয়নে তিনি সর্ব্বদা কন্যার অসহনীয় কুমারীত্বের কথা উত্থাপিত করিয়া স্বামীর শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলেই তিনি বলিতেন—"ও গো! তোমার কখনই কি একটু আক্কেল হ'বে না? মেয়ে যে এদিকে সাত হাত লম্বা হ'য়ে উঠ্‌লো!"

স্বামীটি কিন্তু আপনার পর্ব্বতপ্রমাণ নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া কখনই ধারণা করিতে পারিতেন না যে, আমাদের এই সামান্য পার্থিব পৃথিবীতে কোন মানব বা মানবী, বিশেষতঃ বঙ্গের অন্তঃপুরবদ্ধা লম্ফ-ঝম্ফ-বিরহিতা বালিকা, কখনও সপ্তহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইতে পারে। অতএব তিনি অলস ও অকর্ম্মণ্যের ন্যায় কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কন্যার একাদশ বৎসর, দ্বাদশ বৎসর, ও ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। কন্যা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরুণী হইয়া উঠিল ; যৌবন ধীরে ধীরে বালিকার ললিত দেহের উপর আপন লালিত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

পত্নী সুকণ্ঠে ঝঙ্কার পূরিয়া অহরহঃ পতির নিকট অভিযোগ করিতে লাগিলেন,—"ওগো! এবার আমার জাত কুল সব গেল। এখনও যদি তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে না পার, আমি আর লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।—আফিম্ খেয়ে, বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে, জলে ডুবে মরবো।"

যদিও অহিফেন সেবন, হলাহলগ্রহণ, রজ্জু বন্ধন বা জল-নিমজ্জন প্রত্যেক প্রক্রিয়াটিই পৃথক ভাবে প্রাণত্যাগের যথেষ্ট উপায় হইতে পারিত, তথাপি অলস ও অকর্ম্মণ্য স্বামীর সম্পূর্ণ চেতনা উৎপাদন করিবার জন্য পত্নী পতির শ্রবণশক্তি-বিরহিত শ্রবণে তিনটি প্রক্রিয়ার কথাই ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এবং আমাদের মনে হয় যে উহাতে স্বামীটির মনেও চেতনা উৎপাদিত হইয়াছিল। কারণ, অতঃপর তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে ছয় মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন; এবং একজন সুপরিপক্ক ঘটককে নিযুক্ত করিলেন। ঘটক সুপাত্রের সন্ধান আনিয়া দিল; এবং তিনি ঘটকের নির্দ্দেশানুযায়ী সুপাত্রগণের দ্বারে দ্বারে কাঙ্গালের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কোন স্থানেই সুপাত্রের সন্ধান পাইলেন না। কোন পাত্র পরিপক্ক বয়স্ক, কোন পাত্র অকালপক্ক; কেহ ধনী কিন্তু বিদ্যাহীন, কেহ বিদ্বান কিন্তু ধনহীন; কেহ সুচরিত্র কিন্তু কুৎসিত; কেহ সুরূপ কিন্তু চরিত্রহীন। ফলতঃ কেহই তাঁহার সর্ব্বগুণময়ী তনয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।

অবশেষে এক পল্লীগ্রামে যাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত জমীদারের বিপুল ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষ করিয়া এবং তাঁহার বিংশতিবর্ষ বয়স্ক সুন্দর ও বিদ্যারত পুত্রকে দেখিয়া, এবং সেই পুত্রের সদ্‌গুণের কথা শতমুখে শ্রবণ করিয়া, তিনি তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু এই বিবাহেরও একটা অন্তরায় উপস্থিত হইল। পাত্রের জমীদার পিতা বিবাহের পণ স্বরূপ এত অধিক

অর্থ দাবী করিলেন যে, তাহা প্রদান করা তাঁহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তিনি একবারে হতাশ হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, যদি পাত্রের পিতা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী এবং অতিগুণময়ী কমনীয়া কন্যাকে একবার স্বচক্ষে অবলোকন করেন, তাহা হইলে, তাহাকে আপন স্নেহময় পুত্রের জীবনসঙ্গিনী করিবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত লালায়িত হইয়া পড়িবেন; এবং তখন আর অধিক অর্থপ্রাপ্তির জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।

অতএব তিনি কন্যাকে দেখাইবার জন্য জমীদার বাবুকে আপন বাটীতে আহ্বান করিলেন।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে দিনের কথা বিবৃত করিয়াছি, ঐদিন জমীদার বাবু সাঙ্গোপাঙ্গগণকে সঙ্গে লইয়া ভাবী পুত্রবধূকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপবেশন জন্য বাহির্বাটীর যে কক্ষটি সজ্জিত করা হইয়াছিল, তাহাতে বৈদ্যুতিক পাখা বা টানা পাখার বন্দোবস্ত ছিল না; এজন্য তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে বাটীর ভৃত্যগণ তাঁহাদিগকে তাম্বুল-তামাকু সরবরাহ করিয়া হাত পাখার দ্বারা তাঁহাদের গ্রীষ্মাপনয়নের চেষ্টা করিল।

ঐদিন পূর্ব্বাহ্নে মাতা কন্যাকে নবনীত সুকোমলা সুন্দরী করিবার জন্য নবনীত প্রভৃতি উপকরণে এবং বহু পরিশ্রমে এক-প্রকার গাত্রানুলেপন প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কন্যার সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরে তাহার কোমল দেহ ও দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি অধম পুরুষজনের অজানিত একপ্রকার

মূল্যবান সাবানের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া তাহা সুগন্ধামোদিত উষ্ণ জলে বিধৌত করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারভারে তরুণীর সুস্থ দেহ বিশেষ ভাবে পীড়িত করিয়া, তাহার উন্মুক্ত কেশরাশিতে মুক্তামালা গ্রন্থিত করিয়া, বিকচ ললাটতল পুনঃ পরিমার্জ্জিত করিয়া, ভ্রূমধ্যে অতি সাবধানে সুন্দর টিপ্-বিন্দু বসাইয়া তাহাকে তাহার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সে বহির্ব্বাটীর সেই সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে আসিয়া, সমাগতগণকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিল। সমাগতগণের সূচীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিতে লাগিল। জমীদার বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল; কক্ষ মধ্যে আলোক সকল প্রজ্জ্বলিত হইল; প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার উত্তাপে, গ্রীষ্মের উত্তাপ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; কিন্তু তাঁহাদিগের অফুরন্ত প্রশ্ন আর ফুরাইতে চাহে না। বালিকা সারাদিন কষ্টকর প্রসাধনের ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, বসনাভরণের ভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল, তাহার পর, এক্ষণে সেই উষ্ম কক্ষে লজ্জাকুণ্ঠিত অঙ্গসকল সঙ্কুচিত রাখিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অতিশয় গ্রীষ্মে তাহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় পরিচারকগণ, কেবলমাত্র আগন্তুকগণকেই ব্যজন করিতেছিল; সে ব্যজনের একটি ফুৎকারও বালিকার দিকে প্রবাহিত হয়

নাই। উন্মুক্ত বায়ুর জন্ত বালিকার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

দেবপ্রতিকৃতির ন্যায় বালিকার মনোমুগ্ধকর আকৃতি দেখিয়া, এবং তাহার প্রশান্ত প্রকৃতি দেখিয়া জমীদার বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু মরুভূমিতে যেমন তামরস প্রস্ফুটিত হয় না, অর্থাকাঙ্ক্ষানলে দগ্ধ জমীদার বাবুর হৃদয় মরুভূমিতেও তেমনই এই অরবিন্দনিন্দিতা অঙ্গনাকে পুত্রবধূরূপে পাইবার কামনা বিকশিত হইল না। তাঁহারা কন্যার স্বরূপ দেখিয়া বা সদ্‌গুণ বিবেচনা করিয়া পণভার লাঘব করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা অগত্যা জমীদারপুত্রকে জামাতৃরূপে পাইবার আশা ত্যাগ করিলেন। জমীদার বাবু পার্শ্বচরগণকে লইয়া প্রস্থিত হইলেন।

কিশোরী নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্বাসগ্রহণ জন্য ছুটিয়া গৃহচ্ছাদে উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্নাময়ী।

আমরা ত বলিয়াছি, সেখানে মধুর মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল; সমস্ত ছাদটি স্নিগ্ধ শীতল চন্দ্রকিরণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বসিয়া বসন্তের নৃত্যকলা দেখিবার জন্য দেবতারা যেন রজতসূত্র রচিত আসন বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ছাদে উঠিয়া তরুণী আপন সুবর্ণখচিত বসনাঞ্চল লুটাইয়া দিল;—তাহার ললিত দেহ হইতে লাবণ্য যেন উথলাইয়া পড়িল। তাহার পর, আঙরাখার, সেমিজের, সায়ার বন্ধন শিথিল করিয়া দিল; মস্তক হইতে মুক্তামালা বিদূরিত করিল। স্নিগ্ধ পবনস্পর্শে তরুণীর আগুল্‌ফবিলম্বিত আলুলায়িত কুন্তল আন্দোলিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন দিক সকল সেই সুন্দর কেশরাশির সুখস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তাহার কোমল অবয়বের মৃদু আন্দোলনে জ্যোৎস্না যেন হাসিয়া উঠিল; তাহার সুন্দর মুখের নিকট আসিয়া চন্দ্রপ্রভা যেন আরও প্রভান্বিত হইয়া উঠিল।

এই অপূর্ব্ব সুন্দরীর আকস্মিক আগমনে কৃষ্ণকিশোর পার্শ্ববর্ত্তী ছাদে বসিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প'ড়ল। একটা অজানিত উল্লাসে তাহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল;—স্থির শান্ত সরোবর সলিল যেন প্রথম পবনস্পর্শসুখ অনুভব করিল। মধু-

মাস, মধুময় বসন্তানিল, মধুর সুধাংশুকিরণ যেন মধুরতর হইয়া উঠিল।

তাহার পর, কৃষ্ণকিশোরের ন্যায় যুবকদিগের পক্ষে যাহা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য, সে তাহাই করিয়া ফেলিল; সে অনিমেষ লোচনে তন্বীর তরুণ দেহশোভা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে আত্মহারা হইয়া ভাবিল, কে এ কিশোরী? কলানিধির কিরণমালা কি ঘনীভূত হইয়া এই অপূর্ব্বা বালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল? শশধরের কিয়দংশ কি ধরাতলে খসিয়া পড়িল? অথবা সে কোনও মায়াবলে এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছে। বুঝি বা এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্বপ্নময়ীকে দেখিয়াছে। পঙ্কজ-পল্লব মধ্যে নীহার বিন্দুটি প্রথম প্রভাতালোকে যেমন জল্ জল্ জ্বলিয়া উঠে, কৃষ্ণকিশোরের বিশাল বিস্ফারিত পদ্মসদৃশ নয়নপদ্মে নীহারের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল বালিকার মধুর মূর্ত্তি তেমনই জল্ জল্ জ্বলিতে লাগিল।

আমরা কৃষ্ণকিশোরের নিন্দা করি; এবং যে যুবক আত্মহারা হইয়া অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহারও নিন্দা করি। কেন না, এইরূপ মোহের দ্বারা আমরা কতকগুলি বাস্তব কথা ভুলিয়া যাই। যে কিশোরীকে দেখিয়া আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় গ্রহণ না করিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়ি. সে হয়ত অন্যের পরিণীতা পত্নী, অথবা অন্য প্রকারে বিবাহযোগ্যা নহে। তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলে নিজের মনোমধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করা হয়, এবং সময়ে সময়ে উহা সমাজ মধ্যেও অশান্তি আনয়ন করে। সুতরাং

এইরূপ মোহপ্রাপ্ত যুবকের নিন্দা করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু আমরা ঐ চন্দ্রকিরণোচ্ছ্বাসের, ঐ বসন্তানিলেরও নিন্দা করি; কেন উঁহারা আপনাদের অদম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া কৃষ্ণকিশোরের হৃদয়টা এমন স্বচ্ছ করিয়া দিল?—এই স্বচ্ছতায় যে সুন্দরীর সুন্দর মূর্ত্তি সহজেই প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। আর আমরা সেই বিধাতা পুরুষেরও নিন্দা করি। কেন না, তিনিই ত আমাদিগের সামাজিক ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া, রমণীগণের রমণীয় মুর্ত্তিতে এমন উন্মাদনা পূরিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে যুবজনের উদ্দাম হৃদয় সহজেই উন্মত্ত হইয়া উঠে।

কৃষ্ণকিশোর কতক্ষণ অচেতন হইয়া সেই অপূর্ব্বা তরুণীকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ, সময়, সে সময়টা অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; হয়ত সে সময়, কৃষ্ণকিশোরের হৃদয়স্পন্দন ও শোণিত প্রবাহও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মেসের ছাত্রগণ ক্রিকেট খেলা দেখিয়া প্রত্যাগত হওয়ায়, তাহাদিগের তর্ক বিতর্কের কোলাহলে, তাহাদিগের পাদুকা-উত্থিত শব্দে কৃষ্ণকিশোর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইল। তখন সে বুঝিল যে সে একটা মহা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে; পরস্ত্রীর প্রতি সেরূপ মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে একটা নীচজনোচিত কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সে মনে করিল, তদ্দণ্ডেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রস্থান জন্য সে ত্বরিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল; বুঝি তাহাতে একটু শব্দ হইল।

তরুণী এতক্ষণ অনুভব করিতে পারে নাই যে পার্শ্ববর্ত্তী ছাদে অন্য কেহ বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ ঐ ছাদে ইতিপূর্ব্বে কাহাকেও কখনও উঠিতে না দেখায়, তাহার মনে ঐরূপ ধারণাও স্থান পায় নাই। কৃষ্ণকিশোর দণ্ডায়মান হইবামাত্র সে চকিত নেত্রে তাহাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। কোনও লোক ত কখনও ছাদে উঠে না, সে ভাবিল তবে এ যুবক কে? সে অত্যন্ত ভীতা হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে আপনার পরিধান বাস সংযত করিতে করিতে ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কে? কে আপনি?'

কৃষ্ণকিশোর বুঝিল যে কিশোরী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভীতা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সে কিছু অপ্রতিভ হইল; এবং শীঘ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—'না, না, আপনি ভয় পাবেন না। আমি এখনই চলে যাচ্ছি।'

তরুণী তথাপি কিছু ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—'কে আপনি? আপনি কি ঐ বাড়ীর কোনও লোক?'

কৃষ্ণকিশোর মনে মনে ভাবিল যে, তরুণী যদি তাহাকে ঐ মেসের কোনও ছাত্র বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। অতএব তাড়াতাড়ি সে তরুণীর সন্দেহটা সংশোধিত করিয়া কহিল,—'না, না, আমি এ বাড়ীর কোনও লোক নই। আমি অন্য বাসা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। ছাদে আসা আমার অন্যায় হ'য়েছে। আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমি চল্লাম।

এই বলিয়া কৃষ্ণকিশোর চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার উপদেশ

মত বালিকা স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। কৃষ্ণকিশোর যতক্ষণ ধরিয়া তরুণীর জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিল, তাহার তুলনায় তরুণী অতি অল্পকাল মাত্র কৃষ্ণকিশোরকে দেখিতে পাইয়াছিল বটে, তথাপি সে তাহাকে দেখিয়াছিল, চন্দ্রালোকমধ্যে আলোক স্তম্ভের ন্যায় সেই সুদৃঢ় সুদীর্ঘ দেহ দেখিয়াছিল ; তাহার চন্দ্রকর প্রতিভাত প্রশান্ত ললাটে প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিল, তাহার পদ্মসদৃশ বৃহৎ আগ্রহময় নয়নমধ্যে বালিকার মনোভৃঙ্গ এক অভিনব স্বর্গীয় মধুর আস্বাদন পাইয়াছিল। বালিকা আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। তাহার মনোমধ্যে জ্যোৎস্নাস্নাত সেই দীর্ঘ দেহ, সেই প্রশান্ত প্রশস্ত ললাট, সেই আগ্রহময় দৃষ্টি বার বার আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু শান্তা সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ান্দোলন প্রশমিত করিয়া দিলেন। সে আবার প্রকৃতিস্থ হইল। তখন সে আপন হৃদয়দৌর্ব্বল্যের জন্য নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া ভাবিল,—'ছি, ছি, ছি! কোথাকার কে? তার কথা কেন ভাববো?"

কৃষ্ণকিশোর ছাদের দরজা নিঃশব্দে অর্গলাবদ্ধ করিয়া, নিঃশব্দে ত্রিতলের কক্ষে নামিয়া আসিল। দেখিল, সেখানে ছাত্রগণ একত্র হইয়া মহা তর্কযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছে, 'যতীন রায়ের মত প্লেয়ার ইংলণ্ড আমেরিকাতেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।' কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, 'রেখে দাও, তোমার যতীন রায়। ডি, গজ্‌দর্‌ ব'লে যে পার্শী বোলারটাকে (cowler) হরতুকী বাগান বা

নিয়ে গিছলো, তার বল (ball) ছোড়াটা দেখলে ত?—যেন নেপো-লিয়নের কামানের গোলা। এই প্রতিবাদকের প্রতিবাদ করিয়া অন্য একজন ছাত্র কহিল,—'বাবা! স্বদেশী সীতারাম থাকতে ফরাসী নেপোলিয়নের তুলনাটা তুললে কেন? দেখেছ ত বঙ্কিম বাবুর বর্ণনা!—এক একটি গোলায় এক একটি নবাবী কিস্তি কুপোকাৎ!' অন্য একজন হাত দুলাইয়া গান ধরিল,—

'মুর্গীর আণ্ডা খেলে প্রাণ ঠাণ্ডা
ভজ মন রাধা মাধব।'

কৃষ্ণকিশোর বুঝিল, আজ সে স্থলে অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনার কোন সুবিধাই হইবে না। অতএব সে রাত্র নয়টার সময় আপন মেস বাটীতে ফিরিয়া আসিল; এবং সংক্ষেপে আহারাদি সমাধা করিয়া পাঠে মনোযোগ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একটি বর্ণ বুঝিতে পারিল না।—পুস্তকের বর্ণমালার ছত্রগুলি শরাসন তুল্য কাহার কৃষ্ণ ভ্রূর ন্যায় বক্র হইয়া গেল, সম্মুখস্থ ল্যাম্পের গোলকটি কোন জ্যোৎস্নাময়ীর চন্দ্রালোকিত মুখের ন্যায় তাহার নয়নাগ্রে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে না পারিয়া অবশেষে সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু সহসা সে নিদ্রাদেবীর কৃপালাভ করিতে পারিল না।—তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নাগ্রে কাহার জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি বার বার আবির্ভূত হইয়া তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইল।

কিন্তু আমরা জানি, সুবোধ কৃষ্ণকিশোর পরদিন হইতে আপন মনকে সম্পূর্ণ শাসিত করিতে পারিয়াছিল। এবং সেই দিন

হইতে পরীক্ষা দিবার জন্য অহরহঃ শ্রমসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সেই ছাত্রাবাসের কথা, তন্নিকটবর্ত্তী সেই ত্রিতল বাড়ীর কথা, সেই ত্রিতল বাটীর জ্যোৎস্নালোকিত ছাদের কথা, আর সেই ছাদ-বিচারিণী জ্যোৎস্নাময়ী তরুণীর কথা একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার পর বি, এ, পরীক্ষা দিয়া তাজপুরে ফিরিয়া রাধাকিশোরের আসন্ন বিবাহের কথা মাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছিল; এবং মাতার অনুমতি পাইয়া ঐ বিবাহে যোগদান করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাধাকিশোরও বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বিবাহ করিবার জন্য কৃষ্ণকিশোরের একদিন পূর্ব্বে বাটী আসিয়াছিল। এবং প্রথমে বিবাহোৎসবে, পরে প্রেম পারদর্শিনী নব পত্নীর মধুর নবীন প্রেমের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া, আহারে বিলাসে সুহাসে পরমসুখে সুখময় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিল।

এই সময়ই কৃষ্ণকিশোর ও তাহার মাতা রাধাকিশোরের দুঃখ-ময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন।—হায়! মানুষ যখন সুখের সাগরে ভাসে, তখন কেন ভুলিয়া যায়, 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা।'

একটা মুস্কিলের কথা এই যে, ইঞ্জিনিয়র বাবু কেবল মাত্র তিনটি সহস্র মুদ্রার জন্য রাধাকিশোরের ন্যায় সুন্দর ও সুশিক্ষিত জমীদার পুত্রকে জামাতৃরূপে লাভ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। ইহাতে রাধাকিশোরের বা রাধাকিশোরের জমীদার পিতার কোন ক্ষতিই হয় নাই।—জমীদার বাবু অন্যত্র অধিক স্বর্ণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এবং রাধাকিশোর চতুর্দ্দশবর্ষীয়ার পরিবর্ত্তে পঞ্চদশ বর্ষীয়া প্রণয়িনী পাইয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছিল। রাধাকিশোর মনে করিত যে, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়ারাও প্রেমপাঠশালার ছাত্রী বটে, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়াগণ আরও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী। ফলতঃ রাধাকিশোরকে জামাতৃরূপে না পাওয়ায় আর কাহারও অনিষ্ট হয় নাই, অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা ইঞ্জিনিয়র বাবুরই হইয়াছিল।

অতএব ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আমাদের ইঞ্জিনিয়র বাবুটি নিতান্ত অপদার্থ লোক। তিনি যে কেবল পত্নী শান্তিময়ীর হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিতে পারিতেন না এমন নহে; তিনি যে অপদার্থ তাহার আরও অনেক আনুসঙ্গিক প্রমাণ ছিল। তিনি মূর্খের ন্যায় কণ্ট্রাক্টরগণের নিকট হইতে অবশ্য

প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন না ; বরং তাহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে অর্থ বা অন্য উপহার প্রদান করিতে আসিলে, তিনি নিতান্ত অভদ্রের ন্যায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিতেন। এজন্য তিনি এক কর্ম্মস্থান হইতে অন্য স্থানে বদলি হইলে পরবর্ত্তী যে সকল ইঞ্জিনিয়র তাঁহার স্থানে কর্ম্ম করিতে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া একবাক্যে বলিতেন, সে লোকটা নিতান্ত ষ্টুপিড্ (Stupid) ছিল ; এমন একটা আর্ণিংএর (earning) ফিল্ডকে একেবারে barren করিয়া গিয়াছে। তাঁহার আরও দোষ ছিল। তিনি কতকগুলি কুপোষ্যকে আপন বাটীতে স্থান দিয়া অকারণ তাহাদের প্রতিপালন ভার আপন স্কন্ধে বহন করিতেন। তিনি নিজে মূল্যবান দ্রব্য আহার করিতেন না, সভ্যজনোচিত পরিচ্ছদও পরিধান করিতেন না, পত্নীকে রত্নালঙ্কারও প্রদান করিতেন না, অধিক দাসদাসীও রাখিতেন না, অথচ একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য মাসিক বেতন হইতে একটি পয়সা সঞ্চয় করিতেন না। তাঁহাকে ধিক! তিনি আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নষ্ট করিয়াছিলেন।

ঐ অপদার্থ ইঞ্জিনিয়রটি আপন কন্যার নামকরণ সম্বন্ধেও নিতান্ত কুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা উপন্যাসলেখক, আমরা সে অশ্লীল নাম তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে শঙ্কিত হইতেছি। কিন্তু সে নামটি আমাদিগকে প্রকাশ করিতেই হইবে। কারণ, সেই আমাদের গুণহীনা আখ্যায়িকার

নায়িকা এবং তাহারই নামে আমাদের ক্ষুদ্র পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়র বাবু উপন্যাসের নায়িকার উপযুক্ত সভ্যজনোচিত মধুর নাম সকল ত্যাগ করিয়া কন্যাকে মোক্ষদা অভিধান প্রদান করিয়াছিলেন। কি বর্ব্বরতা! আচ্ছা, মোক্ষদা শব্দটার অর্থ কি? মোক্ষ দেয় যে। মোক্ষ জিনিষটা কি? মুক্তি! আচ্ছা, 'মুচ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া যে 'মুক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হইল তাহার অর্থ কি? মোচন। মোচন ত সেই মুচ্ ধাতু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব, তাহারও অর্থ মুক্তি। আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি কহিলেন, মোক্ষ অর্থে পরিত্রাণ বুঝায়, এবং মোক্ষদা অর্থে যে স্ত্রী পরিত্রাণ দেয় তাহাকে বুঝায়। হায়! হায়! আমাদের এই সভ্যকার পৃথিবীতে কোনও স্ত্রী কি কখনও কাহাকেও পরিত্রাণ প্রদান করিয়াছে? কোনও পার্থিব পুরুষ কি কখনও মানবশক্তি লইয়া এই মধুরহাসিনী, কটাক্ষশালিনীদের প্রেমূন-পেষণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিয়াছে? আমরাও পরে দেখিব যে মোক্ষদার নাম মোক্ষদা হইলেও, তাহার ভাবী স্বামীটী তাহার নিকট হইতে একটুও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই;—বরং তাহার সুধাময় প্রেমমধুতে, মধুপানরত মক্ষিকার ন্যায় নিতান্ত বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিরর্থক প্রাচীন ও কুরুচিসম্পন্ন নামে কিন্তু ইঞ্জিনিয়র বাবুর কখনও অরুচি হয় নাই। গৃহিণীর অভিলষিত কোনও

সামগ্রী তাহার অভিলাষ মত সংগ্রহ করিতে না পারিলে, যখন তিনি বিরাগভরে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া যাইতেন, তখন কন্যা মোক্ষদা হাসিমুখে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত; তাহার সরল স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার বিশাল নয়নে পিতৃভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া, তাহার কোমল কপোলে আনন্দের দীপ্তি দেখিয়া, ইঞ্জিনিয়র বাবুর বিশুষ্ক হৃদয় স্নেহরসে প্লাবিত হইয়া যাইত। তিনি কন্যাকে আদর করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিতেন,—

'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।'

পিতার আদরে সুখদা মোক্ষদার চক্ষুর্দ্বয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাহার রক্তাধর সদ্যঃস্ফুট গোলাপের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া উঠিত। সে পিতাকে উপবেশন করিতে বলিয়া সত্বরপদে তাঁহার জন্য স্নিগ্ধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিত, তালবৃন্ত সঞ্চালনে তাঁহার তাপক্লিষ্ট দেহ পরিতৃপ্ত করিত এবং মধুর আলাপনে তাঁহার শ্রমক্লান্তির উপশম করিত।

পিতা যখন কর্ম্মস্থানে থাকিতেন এবং মাতা যখন অবাধে মধ্যাহ্ন নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া অম্লরোগ সঞ্চয় করিতেন, তখন মোক্ষদা পিতার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার কথা ভাবিয়া সর্ব্বদা পিতারই কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিতা রাখিত। পিতার কক্ষটি ও কক্ষসামগ্রী সকল সে প্রতিদিন স্বহস্তে সুসজ্জিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিত, তাঁহার পানীয়জলের মৃৎপাত্রটি পরিস্কৃত করিয়া, তাহাতে কর্পূরসুবাসিত শীতল সলিল রাখিয়া দিত, তাঁহার শয্যাটি

রৌদ্রতপ্ত করিয়া ঝাড়িয়া রাখিত, এইরূপে সে অহরহ প্রীতির প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় হাস্যমুখে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতার প্রীতি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিত। ইদানিং বয়োবৃদ্ধির সহিত সে আরও কর্ম্মঠা হইয়া উঠিয়াছিল; এজন্য সে গৃহকার্য্যে ও পিতৃসেবায় আরও তৎপরতা দেখাইতে পারিত।

কন্যার সেবায়, তাহার কার্য্যকুশলতায়, সর্ব্বোপরি তাহার হাস্যময় মধুরতায় ইঞ্জিনিয়র বাবু আপনার স্নেহময় পিতৃহৃদয়মধ্যে কত আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পত্র।

রাধাকিশোর যখন নূতন শ্বশুরালয়ে যাইয়া যৌবনতরঙ্গময়ী পত্নীর প্রেমপারাবারে অবগাহন করিতেছিল, তখন কৃষ্ণকিশোর তাজপুরে মাতার অসীম স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস করিয়া আপনার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে কি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিল? সে দিবাভাগটা মাতার সহিত সাংসারিক এবং জমীদারী ও গোশালা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করিত বটে, কিন্তু নিশিতে কৃষ্ণকিশোর মানসিক অশান্তিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারিত না,—একটি তরুণীর জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ফলকে, গগনপটে পূর্ণেন্দুর ন্যায়, চিত্রিত হইয়া উঠিত; আর সে নিদ্রিত থাকিতে পারিত না। সেই অপূর্ব্ব চিত্রের চিন্তায় চিত্তকে ব্যথিত করিয়া সারানিশি অনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিত। কৃষ্ণকিশোর বার বার ভাবিত, কে এ কিশোরী? সে কি কাহারও বিবাহিতা পত্নী? তাহা হইলে, তাহার চিন্তায় হৃদয় কলুষিত করা কি কৃষ্ণকিশোরের পক্ষে অন্যায় কার্য্য নহে? সে যদি ভিন্ন জাতীয় কোনও ব্যক্তির কন্যা হয়, তাহা হইলেও ত তাহাকে বিবাহ করা কৃষ্ণকিশোরের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু, কিন্তু, সে যদি স্বজাতি, এবং অনন্য

হয়, তাহা—তাহা হইলে কৃষ্ণকিশোরের কি আনন্দ! আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত; কক্ষমধ্যস্থ পুঞ্জীকৃত নৈশ অন্ধকার যেন আলোকিত হইয়া উঠিত! আবার কিয়ৎ কাল পরে নিরাশায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। কন্যার পিতা যদি ধনবান ব্যক্তি হ'ন এবং সামান্য গ্রাম্য জমীদারের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হন? তাহা হইলে, সে কি করিবে? কিরূপে সেই অপূর্ব্বা মোহিনীকে লাভ করিবে?

কয়েক রাত্রি চিন্তার পর সে স্থির করিল যে সর্ব্বাগ্রে বালিকার পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে কি উপায়ে এই পরিচয়টা সংগ্রহ করিবে? সে অনেক ভাবিল, কিন্তু সহসা তাহার মাথায় কোনও সুবুদ্ধিরই উদয় হইল না। সে একবার মনে করিল যে, মাতার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার আদেশ লইয়া গোমস্তাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া বালিকার পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অসংযমী পুত্রের এই নিন্দনীয়া কথা কি মাতার পবিত্র কর্ণে উত্থাপিত করিতে পারা যায়? ছি, ছি, কৃষ্ণকিশোর তাহা কখনই পারিবে না।

অবশেষে হঠাৎ একদিন রাত্রে তাহার চিন্তিত মস্তকে একটা বুদ্ধি আবির্ভূত হইল। সে সেই ত্রিতলবাটীর নিকটবর্ত্তী মেসের বন্ধু উমাপদ বসুকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে, উমাপদ নিশ্চয়ই বন্ধুর কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ঐ বাটীর সকল-লোকের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে সংবাদ দিবে।

ইহা স্থির করিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার

শয্যাগৃহেই একটি ক্ষুদ্র টেবেলের উপর লিখনোপকরণ ছিল। সেই টেবিলের আলোকটা উজ্জ্বল করিয়া লইয়া বন্ধু উমাপদ বসুকে পত্র লিখিতে বসিল।

বাগানবাটী, তাজপুর।
১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩———।

প্রিয় উমাপদ,

তুমি বোধহয় জান যে, আমি বি, এ, পরীক্ষার পরই বাটী আসিয়াছি। আসিবার সময়, বাটী ফিরিবার আনন্দে তোমার সহিত দেখা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এবং বাটীতে আসিয়া আমার খুড়তুতো ভাই রাধাকিশোরের বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তোমাকে পত্রও লিখিতে পারি নাই। এজন্য ক্ষমা করিও।

আজ তোমার নিকট হইতে একটা বিশেষ উপকার পাইবার প্রত্যাশায় তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমার কার্য্যটা সামান্য; তাহা তুমি অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিবে।

তোমার বাসার ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা সরু গলি রাস্তা আছে; তাহা, বোধহয়, তুমি লক্ষ্য করিয়াছ। এই গলির ঠিক পরপারে, এবং তোমাদের বাসাটা যে বড় রাস্তার ধারে আছে, ঠিক সেই রাস্তার সেই ধারে একটা ত্রিতল বাটী আছে। তোমাদের বাড়ীর নম্বর ৭৭; সেই বাড়ীটির নম্বর ৭৬ কিম্বা ৭৮ হইবে।

তুমি কৌশলে অনুসন্ধান করিবে, সে বাটীটি কাহার; এবং এখন সে বাড়ীতে কে বাস করেন; তাঁহারা কি জাতি। ঐ বাটীতে একটি অলোকনামাম্নী রূপবতী বালিকা বাস করেন, তিনি কাঁহার কন্যা, এবং বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা? তুমি একটু কৌশল, অর্থাৎ একটু ট্যাক্ট (tact) খরচ করিতে পারিলেই সংবাদটা অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিবে। ঐ বাটীতে নিশ্চয় কোনও পাচক বা পরিচারক বাস করে; তাহাদের মধ্যে কাহকেও ঐ বাটী হইতে বাহির হইতে দেখিলে, কিম্বা ঐ বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিলে, তুমি একটি চাকর বা একটি বামুন খুঁজিয়া দিবার অছিলায় তাহাকে নিকটে আহ্বান করিবে; এবং নানা প্রকার বাক্যজালে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে সকল সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারিবে। তুমি কৃতকার্য্য হইবামাত্র আমাকে সংবাদ দিবে। কি উদ্দেশ্যে আমি ঐ বাটীর লোকগণের পরিচয় চাই, তাহা তুমি পরে জানিতে পারিবে। অথবা একটু চেষ্টা করিলে এখনই বুঝিতে পারিবে।

ভরসা করি, তুমি ভাল আছ। আমার শরীর বা মনের অবস্থা একটুও ভাল নয়। ইতি

তোমার চিরদিনের
কৃষ্ণকিশোর।

এই পত্রলিখন সমাধা করিয়া কৃষ্ণকিশোর উহা আবরণ মধ্যে বন্ধ করিল; এবং আবরণে ডাক টিকিট লাগাইয়া শিরোনামা

লিখিল ও উহার একপার্শ্বে প্রেরকের নাম ঠিকানা লিখিত করিল। পরে টেবিলের উপরে রাখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল; এবং ভগবানের নিকট বার বার প্রার্থনা করিল, "হে ভগবান! তাহাকে অবিবাহিতা কায়স্থ কন্যা করিও।"

পরদিন প্রভাত হইবা মাত্র কৃষ্ণকিশোর সর্ব্বাগ্রে পত্র খানি লইয়া মাতার অগোচরে স্বহস্তে গ্রামের পোষ্ট অফিসে দিয়া আসিল।

উপরিউক্ত পত্রের উত্তরের জন্য প্রায় পক্ষকাল অপেক্ষা করিয়া যখন সে তাহার কোনও উত্তর প্রাপ্ত হইল না, তখন সে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল। সে স্থির করিল যে, নিজে কলিকাতায় যাইয়া উমাপদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং তাহার সাহায্য লইয়া সেই সুধাময়ী বালিকার সংবাদ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু মাতার নিকট কলিকাতা গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা গোপন রাখিতে হইবে।

অতএব সে মাতাকে কহিল,—"মা, তুমি যদি বল, আমি দু'চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাব।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, এখন কেন কল্‌কাতায় যাবি?"

কৃষ্ণকিশোর প্রধান উদ্দেশ্যটা গোপন রাখিয়া কহিল,—"আমাদের পাশের খবর গেজেটে বার হ'তে এখনও দু' এক সপ্তা দেরী হ'তে পারে। কিন্তু আমি যদি কলকাতায় গিয়ে এখন

একটু চেষ্টা করি, তাইলে গেজেট হবার আগেই খবরটা জানতে পারবো।"

মাতা কহিলেন,—"তা' যা ; দিন কতক কলকাতায় বেড়িয়ে আয় ; এই পাড়াগাঁয়ের হাওয়ায় অনেক দিন বাস করে, তোর শরীরটা যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।'

পাড়াগাঁয়ের হাওয়ায়, অথবা কোনও কুসুমভূষিত দেবতার নিঃশ্বাসের হাওয়ায় কৃষ্ণকিশোরের শরীরটা শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল তাহা কৃষ্ণকিশোর নিজে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিল, সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—'মা, এইবার কলকাতায় গিয়ে যদি জানতে পারি যে ভাল করে পাশ হ'য়েছি, তাহলে কতটা মোটা হয়ে' বাড়ী ফিরবো, দেখবে তখন।'

মাতা ভগবানকে স্মরণ করিয়া পুত্রকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আহা, আমার বাছার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

পরদিন মাতার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকিশোর কলিকাতায় আসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মাতার মনোভিলাষ।

রাধাকিশোরের শুভবিবাহে একজন বুনিয়াদি জমীদারের মত কুলোচিত ব্যয় করিয়া শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় হঠাৎ এক দিন বুঝিলেন যে এ ত বড় মুস্কিলের কথা;—পাওনাদারগণ যে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল !

আমরা শুনিয়াছি, এই কলিকালে নবাবী আমলে এক চতুর চূড়ামণি কর্ম্মচারী তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করিয়া লাভবান হইতেন ; জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্কের সংখ্যা গণিয়া ফেলিয়াছেন ; সত্যযুগে দময়ন্তীকান্ত বিদর্ভরাজ পুণ্যশ্লোক নল ক্ষণকালমধ্যে বৃহৎবৃক্ষের পত্র সংখ্যা গণিতে শিখিয়াছিলেন ; যমরাজের প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত চিত্রগুপ্ত মহাশয় মানবাচরিত অসংখ্য পাপের গণনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কে এমন চিত্রগুপ্ত, কে এমন নলরাজ, কে এমন জ্যোতির্ব্বেত্তা, কে এমন ঊর্ম্মিগণক কর্ম্মচারী আছেন যিনি পাওনাদারগণের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারেন ?—সেই জরাহীন মৃত্যুহীন জাতির সংখ্যা গণনা করিতে হইলে গণিত শাস্ত্রের সমুদায় সংখ্যা ফুরাইয়া যায় ; বোধহয়, কোটি কোটি সেন্সস্ অফিসের কাগজ ফুরাইয়া যায় ; স্বয়ং চিত্রগুপ্তের চিত্তবিভ্রম ঘটে।

ছোটবাবু মহাশয়েরও চিত্তবিভ্রম ঘটিল। তিনি দেখিলেন, যে তাহার পাওনাদারগণকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না; তিনি আরও দেখিলেন যে তাহাদিগের বংশ, রক্তবীজের বংশের ন্যায় ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাদিগকে পূর্ব্বে,পশ্চিমে,উত্তরে, দক্ষিণে, অগ্নিকোণে, বায়ুকোণে, ঈশানে, নৈর্ঋতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, ভয়চকিত লোচনে অবলোকন করিয়া ছোটবাবু মহাশয় বুঝিলেন যে, তাহারা বোধোদয়ের ঈশ্বরের ন্যায় সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। তাহাদের অমর অব্যয় দেহ লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন,যে তাহারা নিশ্চয় দেবতা সাজিয়া স্বর্গে যাইয়া মোহিনীর ভাণ্ডস্থিত সুধা খাইয়া অমর হইয়া আসিয়াছে; অথবা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিয়া লইয়াছে।

এই অনন্ত, অব্যয় ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান পাওনাদারগণ ছোটবাবু মহাশয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি রাস্তায় বাহির হইলে রাস্তার লোক পঙ্গপালের ন্যায় তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; জিজ্ঞাসা করিত,—"কর্ত্তা, এবার বড় ছেলের বিয়েতে অনেক টাকা পেয়েছেন, এবার সুদের ক'টা টাকা মিটিয়ে দেবেন কি?" তিনি বাগানের সরোবরঘাটিকায় সমাগত হইলে পাওনাদারগণ তাঁহার চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় 'শিকড় গাড়িয়া' দণ্ডায়মান থাকিত; কেহ বা আঙরাখা আবৃত দীর্ঘহস্ত ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া প্রাপ্য অর্থ প্রার্থনা করিত; কেহ বা তাঁহার উত্তর শুনিয়া মল্লিকাদামের মত দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিত। তিনি বাজারে প্রবেশ

করিলে, কাপড়ওয়ালা বলিত,—"অনেকদিন দয়া করেন নি, এবার বড়বাবুর বিয়েতে অনেক টাকা পেলেন,সরকারকে একবার পাঠাব কি ?" ময়রা মিশ্রে বলিত,—'জলখাবারের দরুণ তিনশো টাকার ওপর বাকী পড়েছে, একবার যাব কি ?" তিনি আপন গৃহদ্বারে ফিরিয়া আসিলে, পাওনাদারগণ থাইবার গিরিসঙ্কটবিচারী মাসু, ওয়াজির, অফ্রিদি প্রভৃতির ন্যায় বিকট ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিত। তিনি যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, গৃহিণী তালবৃন্ত হস্তে তাহার পার্শ্বে বসিয়া কহিতেন,—"ও গো! বিন্দি ঝির দেড় বছরের মাহিনা বাকী পড়েছে। এই মাসেই ওর বোনপোর বিয়ে। ওকে অন্ততঃ একবছরের মাহিনা দিতে না পারলে ভাল দেখাবে না। তুমি সরকারকে বলে রেখ।" গৃহিণীর খাস ঝি সুখতারা আসিয়া, সুগোল বাহুতে স্বর্ণের অনন্তটি ঘুরাইয়া উহা উপযুক্ত স্থানে বিন্যস্ত করিয়া কহিত,—"বাবু মশায়ের কাছে আমার যে টাকাটা গচ্ছিৎ রেখেছি, তা' থেকে এবার আমায় আঠার গণ্ডা টাকা দিতে হবে। এবার কালশুদ্ধ আছে ; মনে করেছি, এবার এই বোশেখ মাসেই—বলতে নেই—এই ঠাকুর বিশ্বেশ্বরের মাথায় ফুল বিল্বিপত্র চড়াব। আর বড়দাদাবাবুর বিয়েতে কিছু বকসিস্ পাইনি। মাকে বলে রেখেছি, এবার আমি তসর আর হেলেহার নেব। সেটা যেন তীর্থি যাবার আগেই পাই।" জমীদার বাবু দৈবক্রমে তন্দ্রাভিভূত হইলে, পাওনাদারগণের বিকট মূর্ত্তি সকল স্বপ্নপথে তাঁহার আতঙ্কিত অন্তরমধ্যে

আবির্ভূত হইয়া দেব ভূতপতির অনুচরগণের ন্যায় নৃত্য করিত।

আহা, কি কষ্ট! এই কষ্ট, এই উৎপীড়ন হইতে ছোটবাবু মহাশয় কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিবেন?

বিবাহোৎসবের পর হইতে তাঁহার পার্শ্বচরগণ ক্রমে বিরল হওয়ায়, এবং আপন সঙ্গীন অবস্থার কথা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার সুবুদ্ধি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত না হওয়ায়, তাহারা এবিষয়ে কোনও সৎপরামর্শ প্রদান করিতে পারিল না। এক্ষণে তিনি অগত্যা আপনার সুবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন।—তিনি জানিতেন, তাঁহার সুবুদ্ধির পরিমাণ সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বেশী।

প্রথমতঃ তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ঋণের পরিমাণ পঞ্চসপ্ততি সহস্র মুদ্রা অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমীদারী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে, অর্দ্ধাংশেরও অধিক বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু অর্দ্ধ সম্পত্তি পরহস্তগত হইলে, তাঁহার বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক তিন সহস্র মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইবে; ইহাতে দুর্গোৎসব হওয়া দূরের কথা, তাঁহার সংসার যাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না; কলিকাতার বাসা খরচেই যে বৎসরে তাঁহার তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হয়। অতএব তিনি স্থির করিলেন যে, জমীদারী বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইবে না।

কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ, পরিশোধ করিতে না পারিলে ত পাওনাদারগণের কবল হইতে

আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। কয়েক দিন চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, আপনারা স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য বাগানবাটীতে বাস করিয়া, অযথাবৃহৎ পুরাতন ভদ্রাসন বাটী বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। ঐ বাটীর প্রকৃত মূল্য একলক্ষ টাকারও অধিক হইলেও, আপাততঃ খরিদ্দারের অভাবে বাটীটি অনেক কম মূল্যেই বিক্রয় করিতে হইবে। তথাপি ছোটবাবু আশা ক'রলেন যে এই বিক্রয় দ্বারা অনায়াসেই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। তাহাতে ঋণের অধিকাংশই পরিশোধ হইয়া যাইবে; এবং তৎসহ ঐ বৃহৎ বাটী পুনঃ সংস্কারের ব্যয়ও কমিয়া যাইবে. তাহা ছাড়া, দাসদাসী ও দ্বারবান প্রভৃতির সংখ্যাও কিছু কমিবে। এতদ্ব্যতীত গ্রামবাসিগণকে, বিশেষতঃ পার্শ্বচরগণকে বুঝাইতে পারিবেন যে, বাগানবাটীতে পূজার দালান না থাকায় ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি দুর্গোৎসব করিতে পারিলেন না; এইরূপে দুর্গোৎসবের মস্ত একটা ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।

তথাপি ভদ্রাসন বিক্রয়ের মস্ত একটা বাধা ছিল। পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করিতে আপন গৃহিণীর নিকট, পুত্রগণের নিকট, এবং সর্ব্বোপরি পার্শ্বচরগণের নিকট তাঁহার মহা সম্মানের এবং পূর্ণপ্রতিপত্তির লাঘব হইবে। কিন্তু এসম্বন্ধেও একটা কৌশলের কথা তাঁহার বুদ্ধিপূর্ণ মস্তিষ্কে সহজেই উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, সকলের নিকট ঐ পুরাতন পৈতৃক বাটীর নিন্দা প্রচার করিবেন; বলিবেন যে, ও বাটী পুরাতন হইয়াছে; ও

বাটীর দেওয়ালগুলা অত্যন্ত মোটা ও কুদৃশ্য, ও বাটী আধুনিক কালের রুচিসঙ্গত নহে, ওবাটীতে সব কাঠের মোটা মোটা কড়ি, কাছে কাছে বসান, তাই ঘরগুলা বড় হ'লেও বিশ্রী-দেখায়; আধুনিক আদর্শ অনুযায়ী তিনি হাল্‌কা গোছের সুদৃশ্য নূতন হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিবেন বলিয়া ঐ কুদৃশ্য পুরাতন বাটী বিক্রয় করিতেছেন।

উপরিউক্ত সুবুদ্ধির কথা তিনি অবিলম্বে গ্রাম মধ্যে প্রচারিত করিয়া দিলেন, কথাটা প্রেমপীড়িত কৃষ্ণকিশোরের বধির কর্ণে প্রবেশ না করিলেও, তাহার মাতা ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। ঐ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবা মাত্র তিনি মনোমধ্যে স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, তাহার শ্বশুরের ঐ পুণ্যময় ভদ্রাসন, যাহা পূজনীয়গণের পবিত্র নিঃশ্বাসে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাদের প্রীতিময় পুণ্যময় বাক্য সকল প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি প্রথমে পরমারাধ্য শ্বশুরের বড়বধূ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহাতে দেবপ্রতিম স্বামীর স্বর্গাধিক প্রথম আদর লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার প্রাণপুত্তলি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রথম মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহা তিনি কোন ক্রমেই পরহস্ত-গত হইতে দিবেন না; সে গৃহকুট্টিমে কখনই পর পদধ্বনি উত্থিত হইবে না। কিন্তু আপাততঃ তিনি আপন মনোভিলাষের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কৃষ্ণকিশোরও তাঁহার আন্তরিক অভিলাষের কথা জানিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সংবাদ সংগ্রহ।

কৃষ্ণকিশোর মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়া একটু মুস্কিলে পড়িল। যে ছাত্রবাসে সে বাস করিত, সে দেখিল তাহার প্রবেশ দ্বার তালাবদ্ধ; গ্রীষ্মাবকাশে সকল ছাত্রই আপন আপন পল্লীগ্রামের বাটিতে বা দূরে দূরে আপন আপন স্বজনগণের নিকট চলিয়া গিয়াছে। সে চিন্তিত হইল, দুই চারিদিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইলে সে কোথায় বাস করিবে? খুল্লতাত পুত্রগণের বাসাবাটীর কথা একবারও তাহার মনে উদিত হইল না। বন্ধু উমাপদ বসুর কথাই তাহার স্মরণ পথে উদিত হইল;—তাহার পত্র পাইয়া সে কি শুভসংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে, স্বভাবতঃই তাহা জানিবার জন্য, সে আগ্রহান্বিত ছিল।

সে আপনার হাতব্যাগ লইয়া ট্রামে চড়িয়া সত্বর বন্ধুর ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইল। কিন্তু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ছাত্রকেও দেখিতে পাইল না।

আমাদের পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণ ঠাকুর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল,—"তাঁরা সববাই ছুটীতে বাড়ী গেছেন। কেবল চারজনা আইন পড়া বাবু এগ্‌জামীন দেবার জন্যে আবার শীগ্‌গির

ফেরত আসবেন বলে' আমার আর ঝির জেম্মায় বাড়ীটা খোলা রেখে গেছেন।"

কৃষ্ণকিশোর এই উত্তর শুনিয়া চলিয়া গেল না। একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"আমি যদি এই বাড়ীতে দু' চার দিন থাকি, তা'তে কি তোমাদের কোন আপত্তি আছে ?"

বামুন ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরকে চিনিত ; সে বার বার তাহার নাম শুনিয়াছে এবং বার বার তাহাকে সেই বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছে। তাহার উপর পূজার সময় প্রার্থনা করিলে সে কৃষ্ণকিশোরের নিকট কিছু কিছু পুরস্কার পাইত। সে ঝির সহিত পরামর্শ করিয়া কহিল,—"থাকুন না কেন। তাতে আর আমাদের আপত্তি কি ? আপনি খরচ দেবেন, আমরা এনে নিয়ে রেঁধে বেড়ে দেবো।"

কৃষ্ণকিশোর ব্রাহ্মণের হস্তে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কয়েকটি রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া, বন্ধু উমাপদ বসুর কক্ষের উদ্দেশে ত্রিতলে উঠিল।

দেখিল, সেখানে বন্ধুরবরের শয্যাটি, কোনও অজানিত পশুর ন্যায় কুণ্ডলীকৃত হইয়া যেন দীর্ঘ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল ; জলশূন্য কুঁজোটা এবং জলপানের এনামেল্ গ্লাসটা, যেন বৈষ্ণবোৎসবের বৈরাগীর ন্যায়, ধূলিধূসরিত হইয়া কক্ষ কুট্টিমে গড়াগড়ি দিতেছিল ; স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ খণ্ডগুলি, যেন দৈত্যগণের ন্যায় অসমান দন্তসকল বিকশিত করিয়া হাসিতেছিল। কৃষ্ণকিশোর আপনার হাত ব্যাগটি একটি

ধূলিশূন্য স্থানে রক্ষা করিয়া, কুণ্ডলীকৃত শয্যার নিদ্রাভঙ্গ করিল; এবং কক্ষের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিয়া, তাহাতে শয্যাটি বিস্তৃত করিল। পরে হস্ত পদ ধৌত করিবার জন্য, ভগ্ন কুঁজোটি জলপূর্ণ করিবার জন্য, নিম্নতলে 'কলতলায়' নামিয়া আসিল।

কৃষ্ণকিশোরকে কুঁজোয় জলপূর্ণ করিতে দেখিয়া, পুরস্কার প্রত্যাশিনী বুদ্ধিমতী ঝি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"দিন্, বাবু, দিন; কুঁজোটা আমায় দিন্। আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে, জল ভ'রে উপরে রেখে আসব এখন। এসব কাজ কি আপনাদের কত্তে আছে? আপনারা যদি এসব কাজ করেন তাহ'লে আমরা রইছি কি কত্তে?"

ঝি বর্ষীয়সী। সে সাত টাকা বেতন পাইত, এবং বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর ন্যায় বেসাতি ব্যাপারে তিন সাতে একুশটাকা চুরি করিত। ছাত্রগণের কৃপায় সে আপন আহার জন্য এত আহার-দ্রব্য বাটীতে লইয়া যাইত যে, তদ্দ্বারা তাহার নিজের, তাহার বোনপোর, বোনপোর স্ত্রীকন্যার এবং পুষিবিড়ালটার আহার-কার্য্য স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। ঝি বরাদ্দ অনুযায়ী বৎসরে ছয় খানা বস্ত্র পাইত এবং বেবরাদ্দ অনুযায়ী ছাত্রগণের যে সকল বস্ত্র হারাইয়া যাইত তাহাও প্রাপ্ত হইত, এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া সে আরও পাঁচ ছয় খানা বস্ত্র প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এই ঝির 'হাতটান' নামক দোষ থাকিলেও, তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। সে ছাত্রদের আহার কালে এবং তাহাদের রোগে অত্যন্ত যত্ন করিত; সে অত্যন্ত পরিশ্রম

করিতে পারিত, তজ্জন্য গৃহতল ও তৈজস সর্ব্বদা পরিমার্জ্জিত অবস্থায় থাকিত, সে মিষ্ট কথায়, ও সত্বর কার্য্য সম্পাদনে ছাত্রগণকে সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিতে পারিত।

ঝি কৃষ্ণকিশোরের পশ্চাতে জলের কুঁজা লইয়া উপর আসিয়া, কক্ষের অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া কহিল,—"ওমা! এ যে একেবারে আঁস্তাকুড় হ'য়ে রয়েছে! দাঁড়ান দাঁড়ান, বাবু, আমি নীচ থেকে ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আসি; এই বলিয়া সে কুঁজোটি বারান্দায় রাখিয়া, সত্বর সম্মার্জ্জনীর সন্ধানে ধাবিতা হইল; এবং অল্পকালমধ্যে নিম্নতল হইতে আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগত হইল; এবং বিপুল উৎসাহে গৃহসংস্কারে মনোনিবেশ করিল।

কক্ষোত্থিত ধূলার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণকিশোর বারান্দায় আসিয়া দাড়াইয়াছিল। দণ্ডায়মানের স্থান হইতে সে ঝির কার্য্যতৎপরতা লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে একটা সুবুদ্ধির আলো জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, আচ্ছা, এই কার্য্যতৎপর ঝির দ্বারা ঐ দক্ষিণদিকের বাড়ীটার সংবাদ সংগ্রহ করা কি সম্ভবপর হইবে না? অল্প চিন্তার পর সে বুঝিল যে উহা খুবই সম্ভবপর ও সহজ। উহার দ্বারা সংবাদটা সংগ্রহ করিয়া উহাকে কিছু পুরস্কার প্রদান করিলেই চলিবে।

সংমার্জ্জন কার্য্য সমাধা করিয়া ঝি যখন নিম্নে নামিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন কৃষ্ণকিশোর মহা অপরাধীর ন্যায় ক্ষীণ ও বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিল,—"ঝি।"

ঝি বিগত পঞ্চবিংশত বৎসরের মধ্যে সেইরূপ বিহ্বল কণ্ঠে 'ঝি' সম্বোধন শ্রবণ করে নাই। সে বিস্মিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন গা, বাবু?"

কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ভয়ে কহিল,—"দেখ, ঝি, তোমাকে একটা কথা বলিব, তুমি কিছু মনে ক'রো না।"

ঝির বিস্ময় আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সে মনে করিল, এই কুড়ি বছরের ছোকরা তাহার মত ষাট বছরের বুড়িকে এমন কি কথা বলিতে আরে, যাহার জন্য তাহার মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। সে প্রশ্নময় দৃষ্টিতে কৃষ্ণকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণকিশোর পূর্ব্ববৎ ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে কহিল,—"তোমাকে বল্‌ছিলাম কি জান? ঐ দক্ষিণ দিকে ঐ যে তেতালা বাড়ীটা দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

ঝি। হাঁ, তা' বাড়ীতে কি হয়েছে?

কৃষ্ণ। তুমি বলতে পার, ও বাড়ীটা কাদের বাড়ী?

ঝি। তা' আর বলতে পারব না, বাবু? ও বাড়ীতে আমি আগে কায করতাম; ওখান থেকে ছেড়ে এই দু'বছর হ'লো এসেছি।

কৃষ্ণকিশোরের হৃদয় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; সে কম্পিত হৃদয়ে মনে মনে ডাকিল, "হে ভগবান! তোমার কৃপায় ঝির পবিত্র মুখবিবর হইতে যেন শুভ সংবাদ নির্গত হয়।" সে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা কা'র বাড়ী?"

ঝি। ওটা অনাথ বাবুর বাড়ী। তিনি ইঞ্জিনিয়রের কায ক'রেন, তাই লোকে তাঁকে ইঞ্জিনিয়র বাবুও বলে।

কৃষ্ণ। ওঁরা কি জাত বলতে পার?

ঝি। আমরা বোষ্টোম মানুষ, আমরা কি অজাতের বাড়ী কায করতে পারি? ওঁরা খুব ভাল কুলীন কায়েত—মিত্তির কায়েত।

কৃষ্ণ। ও বাড়ীতে ঐ ইঞ্জিনিয়র বাবু ছাড়া, আর কে কে আছেন?

ঝি। তিনি আছেন, গিন্নীমা আছেন, দিদিমণি আছেন, আর জনকতক আপনার লোক আছে, আর ঝি, চাকর বামুন এই সব লোক আছে।

কৃষ্ণ। তুমি যাঁকে দিদিমণি বলছ, তিনি কে?

ঝি। তিনিই ত ঐ অনাথবাবুর আর ঐ গিন্নীমার মেয়ে।—ঐ একটী মেয়ে, আর ছেলেপিলে হয়নি।—মেয়ের মত মেয়ে; যেমন রূপ তেমনই গুণ!

কৃষ্ণ। মেয়েটির বোধ হয় বিয়ে হয়েছে?

ঝি। এখনও বিয়ে হয়নি; তবে অনেক জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে। বোধ হয় দু' এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে।

কৃষ্ণকিশোর ঝি-দেবীর সমধুর কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিল যে, সে বুঝি এইবার স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান পাইয়াছে; এই সিঁড়ি অতিক্রম করিতে পারিলেই সে স্বর্গাধিক স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। জয় ভগবান, তোমার জয় হউক!

কৃষ্ণকিশোর পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া

ঝির হস্তে প্রদান করিয়া কহিল,—"তোমাকে আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আজ আমি যে তোমাকে এই কথাগুলা জিজ্ঞেস করলাম এ কথা তুমি আর কাউকে বলো না।"

ঝি সদ্য অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণকিশোরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নবীন প্রেমিক

সেই দিন বেলা চারিটার পূর্ব্ব হইতেই আকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় রৌদ্রের প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণকিশোর বুঝিল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা আছে। অতএব সে তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল।

সেনেট হাউসের নিকটে যাইয়া সে দেখিল যে, সেখানে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত ছাত্র একত্র হইয়া স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্ম্মরমূর্ত্তির চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে তাহাদের নিকট সংবাদ শুনিল যে আজ ফাইনাল মিটিং (final meeting) বসিয়াছে; আজই বি, এ, ও বি, এস্‌সি, পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে; একজন জোরের সহিত কহিল যে, আগামী শনিবারে রেজল্ট (result) নিশ্চয় জানিতে পারা যাইবে; আর একজন আরও জোরের সহিত বলিল যে শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনেক জানিতে পারা যাইবে। কৃষ্ণকিশোর কোনও পরিচিত অধ্যাপকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় সেনেট গৃহের সম্মুখস্থ সোপানাবলীর এক প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সেখানে সে নীরবে বসিয়া গোলদীঘির জলের মধ্যে ঘন-কৃষ্ণ ঘনাবলীর কৃষ্ণছায়া দেখিল; যেন কাহার আলুলায়িত কেশরাশির কৃষ্ণছবি তাহার মুগ্ধ নয়নপথে পতিত হইল। আকাশে বিদ্যুদালোক বিকশিত হইল, স্বচ্ছ জলমধ্যে সেই আলোক প্রতিবিম্বিত হইল; যেন মুকুরমধ্যে কোন এক পদ্মিনীর রূপজ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল। দীর্ঘিকার তীরভূমিতে পুষ্পবাটিকা-মধ্যে শ্বেত পুষ্প সকল কাহার হসিত আননের ন্যায় হাসিতে লাগিল। একটু বাতাস উঠিল; বায়ুবেগে পশ্চিমাকাশের একখণ্ড মেঘ ছিন্ন হইয়া গেল; গোলদীঘির পূর্ব্বদিকে সৌধমালায় বৈকালিক সূর্য্যরশ্মি পতিত হইল; কৃষ্ণকিশোর মনে করিল, যেন তাহারই হৃদয়ানন্দ গৃহগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাহ্যতঃ কৃষ্ণকিশোর নিস্পন্দ দেহে বিদ্যামন্দিরের সোপানে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরমধ্যে এক অভিনব আনন্দের ঢেউ উঠিয়াছিল। কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে মেসের পরিচারিকার পদ্মমুখ হইতে যে কথামধু তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার সমস্ত হৃদয় মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল; সেই মধু হৃদয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্জ্জগতে উছলাইয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে গোলদীঘির জল, তন্মধ্যস্থিত আকাশের প্রতিবিম্ব, তীরভূমির পুষ্পবাটিকা সম্মুখবর্ত্তিনী গৃহশ্রেণী, সমস্তই মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

নিকটে একজন পরিচিত অধ্যাপক সমাগত হওয়ায় কৃষ্ণ-

কিশোরের মধুর স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া অধ্যাপককে অভিবাদন করিল।

অধ্যাপক প্রসন্ন মুখে কহিলেন,—"আগামী বুধবারের গেজেটে বোধ হয় পরীক্ষার ফল বার হবে। তুমি শনিবারে কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করো, বোধ হয় সে দিন আমি তোমাকে ভাল খবর দিতে পারবো।"

কৃষ্ণকিশোর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং তাঁহাকে পুনরায় অভিবাদন করিয়া ৭৭ নম্বর মেসের বাটিতে ফিরিয়া আসিল।

সে গৃহের আশ্রয় লাভ করিবার অব্যবহিত পরেই ঘনঘটা-রোলে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল; ঘন ঘন বিদ্যুৎপাতে দিক সকল চমকিত হইয়া উঠিল। সে বন্ধুবরের বিছানায়, বৃষ্টিপাতের ঘোর রব মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিল। বর্ষাভারাক্রান্ত জলধরকে তাহার মন যেন নির্ব্বাসিত যক্ষের ন্যায় কহিতেছিল,—

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুস্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।"

* * * *

জলধরাঙ্গে বিদ্যুৎ আলোক দেখিয়া এক বিদ্যুৎ-বিভাময়ীর কথা তাহার স্মরণপথে উদিত হইতেছিল। বৃষ্টিপাতের শব্দে তাহার মনে হইতেছিল, কে যেন সন্ধ্যাসমাগমে তাহারই বিরহে টপ্ টপ্ অশ্রুপাত করিতেছে।

দুই দণ্ড পরে বারিবর্ষণ মন্দীভূত হইল। আরও কিয়ৎকাল পরে, বন্দরবন্ধনছিন্ন বহির্গামী জাহাজের ন্যায় মেঘসকল দিগ্বিদিকে

চলিয়া গেল। জ্যোৎস্নাময়, তারকাময়, নীলাকাশ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আর একটি জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যার কথা কৃষ্ণকিশোরের মনোমধ্যে উদিত হইল। আজ এখন ছাদে উঠিলে সে কি আবার সেই জ্যোৎস্নাময়ী তরুণীকে দেখিতে পাইবে? ছাদে উঠিয়া গোপনে তাহাকে দেখাটা কি তাহার পক্ষে উচিত কার্য্য হইবে? সে যখন স্বজাতীয়া ও অবিবাহিতা এবং কৃষ্ণকিশোরই যখন তাহাকে নিশ্চয় বিবাহ করিবে, তখন বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে আর একবার দেখিতে দোষ কি?

হঠাৎ কৃষ্ণকিশোরের মনে পড়িয়া গেল যে অন্য স্থানে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। যদি তাহার বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্ব্বেই অন্য বর আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলে? কৃষ্ণকিশোরের বলিষ্ঠ বাহু স্ফীত হইয়া উঠিল; তাহার অন্তরাত্মা যেন একটা বিকট চীৎকারে গগনমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়া কহিল, সাবধান অজ্ঞ বরপক্ষগণ! আমার এই দুর্দ্দমনীয় প্রেমের সমক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে সাহস করিও না।—আমি বজ্রসদৃশ একটি মুষ্ট্যাঘাতে অন্য বরের হসিত আননের বিকশিত দন্তপংক্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিব। আমার সেই জ্যোৎস্নাময়ী কিশোরীকে যে অর্ব্বাচীন বর আমার এই প্রেমবন্ধন হইতে কাড়িয়া লইতে আসিবে, বাসুকীর মত সহস্র ফণা বিস্তৃত করিয়া তাহাকে আমি বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিয়া দিব। ভীমের পদাঘাত তলে কীচকের ন্যায়, তাহাকে আমি একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিব। পরক্ষণে একটা

বালিশে পদাঘাত করিয়া কৃষ্ণকিশোর তাহা কক্ষ প্রান্তে ছুড়িয়া ফেলিল।

ঠিক সেই সময়ে বৃদ্ধা ঝি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে নবীন প্রেমিকের মনস্তত্ত্ব অনবগত থাকিয়া, এবং পদাঘাতে উপাধান নিক্ষেপের সহিত প্রেমের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া, চমকাইয়া উঠিল, এবং কিছু ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, বাবু, বালিশটার কি বিছে ফিছে কিছু ছিল নাকি ?"

কৃষ্ণকিশোর চেতনা লাভ করিয়া লজ্জিত কণ্ঠে কহিল,—"ঝি, ঝি নাকি ? তুমি কখন এলে ?"

ঝি বালিশটা কুড়াইয়া তাহা আলোকের নিকট আনিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"কই, এতে ত বিছে ফিছে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে বাবু।"

কৃষ্ণকিশোর সংক্ষেপে একটা, 'নাঃ' বলিয়া ভাবিল, ঝির শুভাগমনের কারণ কি ? ও কি ভবানী হইতে কোনও শুভ সংবাদ আনায়ন করিয়াছে ? সে আশান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঝি, তোমার কি কিছু বলবার আছে ?"

ঝি কৃষ্ণকিশোরের নিকট পূর্ব্বে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব বালিশটি শয্যাপ্রান্তে রাখিয়া এবং তৎপ্রসঙ্গ আর উত্থাপিত না করিয়া কহিল,—"বামুন ঠাকুর খাবার ওপরে নিয়ে আসবে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।"

কৃষ্ণকিশোর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"খাবার! কি খাবার ?"

বৃদ্ধা ঝির বৃদ্ধকর্ণে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটা পৌছায় নাই; পৌছিলেও, দীর্ঘনিশ্বাসে বিচলিত হইবার বয়ক্রম সে অতিক্রম করিয়াছিল। সে কহিল,—"বামুনঠাকুর রুটী তৈরী করেছে, হাঁসের ডিমের কালিয়া করেছে, আর আলু পটল ভেজেছে; আর আমি বাজার থেকে আম আর সন্দেশ এনেছি।"

কৃষ্ণকিশোর মোহপ্রাপ্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন এনেছ ?"

ঝি কহিল,—"খুব ভাল টাট্‌কা সন্দেশ; তাই আপনি খাবেন বলে এনেছি।"

কৃষ্ণকিশোর দাঁড়াইয়া উঠিল। এবং অগ্রসর হইয়া কহিল,—"চল, খাইগে।"

ঝি কহিল,—"নীচেটা জলে জলময় হ'য়ে রয়েছে। তাই বামুন ঠাকুরকে খাবারটা ওপরে আনবার কথা বলছিলাম।"

বামুন ঠাকুর খাদ্যদ্রব্য উপরে আনিয়া দিল। কৃষ্ণকিশোর অল্পমাত্র আহার করিল। বাকী খাদ্য ঝি বোনপোর জন্য লইয়া গেল। বোনপো উহার নিকৃষ্ট অংশ খাইয়া, উৎকৃষ্ট অংশ প্রেমিকা পত্নীর জন্য রাখিয়া দিল; পত্নী তাহার সুস্বাদু অংশ পুত্রের প্রভাত ভোজনের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট নিজে আহার করিল।

আহারাদির পর কৃষ্ণকিশোর ঘড়ি দেখিল;—তখন দশটা

বাজিয়া গিয়াছিল। সে নবীন প্রেমিক হইলেও এটা বুঝিয়াছিল যে রাত্রি দশটার পর কোনও প্রেমময়ীই নবীন প্রেমিকের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ছাদে আরোহণ করে না। অতএব সে শয্যাটী ঝাড়িয়া লইয়া শয়ন করিল।

বৃষ্টিপাতে ধরণী শীতল হইয়াছিল; এজন্য সে সুখ নিদ্রার প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু যে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত থাকিতে পারিল না। এবার তোমরা যেন মনে করিও না যে সেই জ্যোৎস্নাস্নাতা মোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি তাহার নিদ্রাপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার উপবাসী শয্যামৎকুণগণ রক্তপিপাসু হইয়া সদলে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া অঙ্গে প্রত্যঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিল, বন্ধু উমাপদ কিরূপে এই উৎপাত সহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কঠিন অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা করিত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দাতা ছোটবাবু মহাশয়ের দান।

ছোটবাবু মহাশয় পার্শ্বচরগণের নিকট এবং জেলার উকিল ও সেরেস্তাদার পেস্কার নাজির প্রভৃতি জেলার কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে বৃহৎ 'জমীদার বাটীর' উপযুক্ত মূল্য, বাটীটা কিছু পুরাতন হইলেও, একলক্ষ টাকার এক পয়সা কম নহে; কিন্তু বাটীটা সুদৃশ্য না হওয়ায়, ষাট হাজার টাকা মাত্র নগদ মূল্য পাইলেই তিনি উহা ছাড়িয়া দিবেন।

শুনিয়া পার্শ্বচরগণ একবাক্যে কহিল,—"ষাট হাজার টাকায় ছেড়ে দিলে বাড়ীটা এক রকম বিনা মূল্যেই দেওয়া হ'বে।"

জেলার উকীল সেরেস্তাদার প্রভৃতি কহিলেন,—"অত বড় বাড়ীর মোটে ষাট হাজার টাকা দাম! লোকে একেবারে লুফে নেবে।"

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি কেহই বাটীটা লুফিয়া বা অন্য কোনও প্রকারে গ্রহণ করিল না। ছোটবাবু মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন যে দেশের লোক সকল নিশ্চয় হস্তী-মূর্খ; তাহারা লক্ষ টাকার সম্পত্তি, প্রায় অর্দ্ধমূল্যে পাইয়াও তাহা লইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে না।

দুই তিন সপ্তাহ পরে ছোটবাবু মহাশয় আবার প্রচার

করিলেন যে শীঘ্র নূতন সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হওয়ায়, তিনি পুরাতন বাটীটা সত্বর হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক। এজন্য ষাট হাজার টাকার পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলেই বাটীটা ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু এবারও হস্তীমূর্খ বঙ্গবাসিগণ সদ্জ্ঞান লাভ করিতে পারিল না। ফলতঃ কেহই বৃহৎ জমীদার বাটী এবং তৎসংলগ্ন সরোবর বাগান প্রভৃতি সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকাতেও ক্রয় করিতে অগ্রসর হইল না।

ইত্যবসরে ঋণদাতাগণ, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ শব্দে তাঁহাকে অহরহঃ নির্য্যাতিত করিতে লাগিল।

তখন ছোটবাবু মহাশয় কহিলেন যে চল্লিশ হাজার টাকা পাইলেই তিনি বাটী বিক্রী করিবেন। একথা নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের ও কলিকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তির কর্ণে পৌঁছিল। জমীদারগণ অন্যের জমীদারীতে বৃহৎবাটী ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; কিংবা বোধ হয়, তাঁহারাও ছোটবাবুর মত অবস্থাতেই পতিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ধনীগণ বুঝিলেন যে পল্লীগ্রামে সেরূপ বৃহৎ বাটী ভাড়া লইবার লোক পাওয়া যাইবে না, অতএব উহা ক্রয় করিলে অনর্থক অর্থের অপব্যয় হইবে মাত্র। এজন্য কেহই চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যেও 'জমিদার বাটী' ক্রয় করিল না।

এদিকে পাওনাদারগণ ও ডিগ্রিদারগণের অসহনীয় উৎপীড়নে ও অপমানে জমীদার বাবু নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল; জল সেচনের অভাবে

তাঁহার বাগানের ফুলগাছ শুকাইয়া গেল; খাদ্যাভাবে ময়ূরগণ বড় বধূঠাকুরাণীর গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জমীদারবাবু গৃহিণীর নিকট আপনার দুঃসহ আর্থিক অবস্থার কথা কিছুই বলিতেন না বটে, কিন্তু গৃহিণী স্বামীসেবা-পরায়ণা বঙ্গলক্ষ্মী; স্বামীর দুঃখের কথা কে যেন তীক্ষ্ণধার ছুরীর দ্বারা তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঁকিয়া দিত; স্বামীর হৃদয়ে কোন স্থানে ব্যথা তাহা বোধ হয় তিনি স্বামী অপেক্ষা অধিক জানিতেন। অহরহঃ স্বামীর বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বামীকে কখনই কোনও উপদেশ প্রদান করিতেন না; কিন্তু আজ আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না; আজ তিনি স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তুমি এত ভাব কেন? ধার হ'য়েছে? ধার ত অনেক লোকেরই হয়। আর তোমার ধার শোধের ভাবনা কি? তোমার বিষয় রয়েছে, বাড়ী রয়েছে; তাই বিক্রি করে ধার শোধ দাও।"

জমীদারবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"এই বাড়ীটা বিক্রি করেই ধার শোধ দেব মনে করেছি; কিন্তু এক জনও খদ্দের পাচ্ছিনে।"

গৃহিণী কহিলেন,—"দেখ তুমি যদি বল, আমি বাড়ী কেনবার কথা একবার ও বাড়ীর বড় দিদিকে বলি।"

ছোটবাবু মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"য়্যা! তুমি ও বাড়ীর বড় বৌঠাকুরুণের কথা বলছ? তুমি এত দিনেও তাঁকে

চিন্‌লে না? তিনি চল্লিশ হাজার টাকা বার করে বাড়ী কিন্‌বেন?"

গৃহিণী কহিলেন,—"কেন কিন্‌বেন না? তাঁর হাতে যদি টাকা থাকে, অন্ততঃ আমাদের উপকার করবার জন্তে তিনি নিশ্চয়ই বাড়ীটা কিন্‌বেন।"

ছোটবাবু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"টাকা তাঁর যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেই টাকা খরচ করে যে শ্বশুরের বাড়ী কিন্‌বেন, এ কথা আমার বিশ্বাসই হয় না; সে হাত থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বেরবে একথা কেউ বিশ্বাস কর্ত্তে পারে না।"

গৃহিণী। আমার মনে হ'চ্ছে, তিনি শ্বশুরের বাড়ীটা পরহস্তগত হ'তে দেবেন না। আমরা যদি তাঁকে বলি যে এবাড়ী বিক্রি হবে, তা হ'লে আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় এ বাড়ী কিন্‌বেন। আর তিনি এ বাড়ী কিন্‌লে, আর কৃষ্ণকিশোরকে নিয়ে এ বাড়ীতে এসে বাস করলে, আমাদেরও ততটা কষ্টবোধ হ'বে না। অপর লোকে আমার শ্বশুরের বাড়ী কিনে তাতে বাস করলে, তাতে আমোদ আহ্লাদ করলে, আমাদের যতটা কষ্ট আর অপমান বোধ হ'ত, তিনি এ বাড়ীতে এলে তেমন কিছুতেই বোধ হবে না। তাঁর বড় ছেলের ছেলেকে বাড়ীতে বাস করতে দেখ্‌লে স্বর্গে আমার শ্বশুর ঠাকুরও প্রসন্ন হবেন।"

ছোটবাবু। তুমি একটুও বুঝলেনা। বড় বৌঠাক্‌রুণকে একটুও

চেন না। তিনি জমিদারের উপযুক্ত বড় বাড়ী আর ধূমধাম কিছুই পছন্দ করেন না; আর শ্বশুরের প্রসন্নতারও ধার ধারেন না। টাকা, টাকাই তাঁর সর্ব্বস্ব। তিনি কখনই এ বাড়ী কিনবেন না।

গৃহিণী। তবু তুমি যদি বল, আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

ছোটবাবু। তুমি যখন কিছুই বুঝবে না, তখন তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়, কর।

গৃহিণী। আমি আজই ওখানে যাব।

ছোটবাবু। যেও।

গৃহিণীকে এই অনুমতি প্রদানের পর, ছোটবাবু মহাশয় কতকটা নিশ্চিন্ত মনে একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিতে পারিলেন। তাঁহার বুদ্ধিহীনা গৃহিণীর উপর তাঁহার কোনও আস্থাই ছিল না বটে, কিন্তু সেই নির্ব্বোধ গৃহিণী যখন তাঁহার কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন, তখন, কি জানি কেন, তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।—তিনি ত জানিতেন না যে, যে বুদ্ধিহীনা সাধ্বীর অন্তরতম প্রদেশ পতির অন্তরব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠে, তাহার স্বামীর ক্ষুদ্র একটি ফুৎকারে দুশ্চিন্তার মেঘ এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

সেই দিন দিবাবসান কালে ছোটবধূঠাকুরাণী বড় বধূঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকিশোর পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য কলিকাতায় যাওয়ায়, তিনি নিষ্কর্ম্মা

হইয়া একাকীই বাটীতে বসিয়া ছিলেন। ছোটবধূঠাকুরাণী তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া, বাটী ক্রয় জন্য অনুরোধ করিলেন।

শুনিয়া বড়বধূঠাকুরাণী কহিলেন—"দেখ, ছোট বৌ, আমার হাতে যদি এখন চল্লিশ হাজার টাকা থাক্‌ত, তাহলে, আমি চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েই বাড়ীটা কিনতাম। কিন্তু এখন আমি ত্রিশ হাজার টকোর বেশী খরচ করতে পারবে না। এতে যদি ঠাকুরপো রাজি হ'ন, তা'হলে একটা লেখাপড়া করে দিয়ে, টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে বলো। বলো, যে লেখা পড়াটা জেলায় গিয়ে কোনও উকীলের দ্বারা করলেই ভাল হয়। আর বাড়ী আমাকে বিক্রি না ক'রে কৃষ্ণকিশোরকেই বিক্রি করবেন। আরও একটা কথা শুনে যাও। ভাইপোকে বিক্রি করছেন বলে হয়ত তাঁর একটা লজ্জাবোধ হ'তে পারে। তাই তা'কে বল্‌বে যে, দলিলে বিক্রি বথাটা না লিখে, তিনি লিখবেন যে ভাইপো এই বাড়ী নিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তার প্রতি স্নেহ-বশতঃ কেবলমাত্র ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে তিনি ঐ বাড়ী তাকে দান করলেন।

ছোটবাবু মহাশয় যথাকালে সংবাদটা শ্রবণ করিলেন; এবং মনে করিলেন যে বিক্রয়ের লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, দানের গৌরবলাভ করিবার জন্য, দশহাজার টাকা কম মূল্য অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারা যায়। তিনি আরও ভাবিলেন যে এই ত্রিশ হাজার টাকাটাই সত্ত্ব হস্তগত করিতে পারিলে, তিনি পাওনাদারগণকে আশু নিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

অতএব তিনি পরদিনই জেলার নগরে যাইয়া উকিলের দ্বারা দানপত্র বা বিক্রয়ের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বড়বধূ-ঠাকুরাণীকে তাহা দেখাইলেন; এবং আর একদিন পরে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে দলিল লিখিয়া উহা রেজেষ্টারি করিলেন; এবং সন্ধ্যা-কালে বাটী ফিরিয়া আসিয়া দলিলখানি বড়বধূঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইয়া ত্রিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। আরও দুই দিন পরে তিনি বাটির দখল ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগান বাটিতে যাইয়া বাস করিলেন।

কৃষ্ণকিশোর বা রাধাকিশোর কেহই এ সংবাদ শুনিল না।— দুইজনই তখন প্রেমরঙ্গমঞ্চে নবপ্রেমাভিনয়ে প্রবৃত্ত ছিল; একজন বিরহের আর একজন মধুর মিলনের অভিনয়ে ব্যাপৃত ছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষার ফল

পরদিন বন্ধুবরের মৎকুণালঙ্কৃত শয্যা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকিশোর মুখহাত ধুইয়া ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল।

চলিতে চলিতে প্রভাতপবনে তাহার উত্তরীয়াঞ্চল উড়িতেছিল, তাহার হস্তদ্বয় দুলিতেছিল, তাহার প্রশস্ত বক্ষঃ মারুতালিঙ্গনে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার অন্তর মধ্যে মোহিনী আশা ক্রীড়া করিতেছিল। প্রভাতালোকে বহির্জগৎ যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, উজ্জ্বল আশায় তাহার হৃদয়ও তেমনই প্রফুল্ল হইয়াছিল। আশা তাহার কাণের কাছে বলিয়া দিতেছিল যে, নিশ্চয়ই সেই মনোমোহিনী কিশোরীর চন্দ্রালোকিত মুখচন্দ্র অবিলম্বে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার হৃদয়গগন আলোকিত করিবে। যেমন করিয়া হউক সে নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিবে; নিশ্চয়ই সে অন্য কাহারও বধূ হইবে না। কৃষ্ণকিশোর ভাবপ্রবণতার স্রোতে পড়িয়া একটা কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ভাবে নাই যে, কাহাকেও বিবাহ করিতে হইলে অগ্রে সে কথা মাতাকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য; ইহাও চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, সে কথাটা মাতার নিকট প্রকাশ করা কতটা দুরূহ ও লজ্জাকর ব্যাপার।

কৃষ্ণকিশোর যখন পথ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত অন্তরানন্দ উপভোগ করিতেছিল, তখন বাহিরেরও তাহার জন্য একটা আনন্দ অপেক্ষা করিতেছিল।

যে পথে কৃষ্ণকিশোর ভ্রমণ করিতেছিল, সে দেখিল সেই পথেই তাহাদের কলেজের ইংরাজির প্রফেসার দুই তিনটি ছাত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। দেখিয়া সে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাকে দেখিয়া, অধ্যাপক মহাশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে কৃষ্ণকিশোর! তুমি দেশ থেকে কবে এলে?"

কৃষ্ণকিশোর বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিল,—"আজ্ঞে আমি কাল এখানে এসেছি।"

অধ্যাপক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কলকাতায় কোন দরকার আছে কি?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"অন্য কিছু দরকার নেই। পরীক্ষার ফল জানতে এসেছিলাম।"

অধ্যাপক আবার প্রশ্ন করিলেন,—"জানতে পেরেছ কি?"

কৃষ্ণকিশোর। আজ্ঞে না; শুনছি, পরশু শনিবারের আগে খবরটা জানতে পারা যাবে না।

অধ্যাপক। হাঁ, শনিবারের আগে শেষ মীমাংসা হবে না। তবে এ বিষয়ে তোমাকে বোধ হয় আমি একটু সাহায্য করতে

পারি। তুমি খাওয়া দাওয়ার পর একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'র; আজ আমি দুই এক ঘণ্টার জন্যে কলেজে যাব।

কৃষ্ণকিশোর অধ্যাপকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল গোলদীঘির তৃণাচ্ছাদিত তীরভূমিতে বিচরণ করিয়া, বন্ধুবরের ছারপোকাগন্ধামোদিত শয্যায় আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিল।

বৃদ্ধা ঝি পুরস্কারদাতা বাবুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ত্রিতলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, সামনের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা এনে দেব কি? বেশ ভাল চা। এ বাসার সকল বাবুই ঐ দোকানের চা খেতেন।"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"চা আমি খাইনে। তুমি একটা পাতিনেবু আর একটু মিছরি কিনে এনে আমাকে একটু সরবত করে দিতে পার ত ভাল হয়।"

ঝি কৃষ্ণকিশোরের নিকট কয়েকটা পয়সা চাহিয়া লইয়া অবিলম্বে লেবু ও মিছরি ক্রয় করিয়া আনিল; এবং বাকী পয়সা আপন বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া কৃষ্ণকিশোরকে শীতল সরবৎ করিয়া দিল। কৃষ্ণকিশোর উহা পান করিলে, ঝি জিজ্ঞাসা করিল,—"বামুন ঠাকুরকে কি কি রাঁধবার কথা বলবো, বাবু?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"এই মাছের ঝোল, আলুভাতে, ভাত আর একটা কিছু অম্বল হ'লেই হ'বে এখন। আর বামুন ঠাকুরকে বলো, যে আমি এগারটার আগেই খাব।" এই বলিয়া

কৃষ্ণকিশোর বাজার খরচ জন্য ঝির হাতে অর্থ প্রদান করিল।

ঝি তাহা গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণকিশোর আবার নীরবে বসিয়া আপনার মধুর চিন্তায় মনোনিবেশ করিল; এইরূপে দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল। তাহার পর স্নানহার করিয়া সে কলেজের দিকে অগ্রসর হইল।

কলেজে আসিয়া সে দেখিল যে তখনও সেই অধ্যাপক কলেজে আসেন নাই। তখন গ্রীষ্মাবকাশের ছুটী থাকায় কোনও ছাত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। সে দেখিল সেখানে কেবল মাত্র একজন অধ্যাপক, আর লাইব্রেরিয়ান ও কেরাণীবাবুগণ উপস্থিত আছেন। সে ইংরাজির অধ্যাপকের আগমন প্রতীক্ষায় সিঁড়ির কাছে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে অধ্যাপক মহাশয় কলেজে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি সিঁড়ির নিকট কৃষ্ণকিশোরকে দেখিয়া হর্ষপ্রফুল্ল মুখে কহিলেন,—"এস, আমার সঙ্গে উপরে এস।"

কৃষ্ণকিশোর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

ধীরে ধীরে অধিরোহিণীশ্রেণীতে আরোহণ করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে কহিলেন,—"তুমি পাশ হ'য়েছ। আর ইংরাজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেছ।"

কৃষ্ণকিশোরের হৃদয়, আনন্দোবেগে এবং ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

অধ্যাপক মহাশয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"শোন, তোমার কৃতকার্য্যতার জন্য আমাদের ভারি আহ্লাদ হয়েছে, আর মনে মনে একটা গৌরবও বোধ কচ্ছি। এই পাশের খবরটা আমি সকালেই তোমাকে দিতে পারতাম; কিন্তু সে সময় আমার সঙ্গে অন্য ছাত্র ছিল; তাদের সুমুখে গেজেট হবার আগে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তুমিও এ খবরটা আপাততঃ গোপনেই রেখ।"

কৃষ্ণকিশোর আপনার প্রতিশ্রুতি জানাইয়া কহিল—"কিন্তু যদি আরও কিছু জানতে দেন, তাহলে বড় উপকার হয়। আমার এক বন্ধু উমাপদ বসু বি, এস্‌সি পরীক্ষা দিয়েছিল।"

অধ্যাপক কহিলেন,—"ওঃ! উমাপদ বসু! উমাপদ বসু! অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে শুনছিলাম সে নাকি অঙ্কে অনাসে তৃতীয় স্থান পেয়েছে।"

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করিল,—"আর রাধাকিশোর সিংহ?" অধ্যাপক প্রবীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিলেন না। কহিলেন,—"সকল নাম আমি মনে রাখতে পারিনি। তুমি পশু শনিবার বেলা তিনটার পর আর একবার কলেজে এসে রাধাকিশোরের খবরটা জেনে নিও।"

কৃষ্ণকিশোর কলেজ লাইব্রেরীতে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া, সন্ধ্যাপর্য্যন্ত গোলদীঘির ধারে একটা বেঞ্চে উপবেশন করিয়া কাটাইয়া, সন্ধ্যার পর বন্ধুবয়ের ছারপোকাসেবিত শয্যায় প্রত্যাগত হইল।

সেই শয্যায় বসিয়া মৎকুণদংশন জালা ভুলিয়া সে আপন হৃদয়ের অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু আপন পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল বলিয়া যে আনন্দিত হয় নাই। সে আনন্দিত হইয়াছিল, সে মনোনীতা অনিন্দিতা ভাবী বধূর আরও উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া।—সে কি আনন্দ, তাহা, তাহার মত অবস্থায় পড়িয়া যে না উপভোগ করিয়াছে, সে কখনই অনুভব করিতে পারিবে না। বুঝি মালাকর ইষ্টদেবীকে উপহার দিবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মালা গাঁথিয়া যে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করে, অথবা সুনিপুণ স্বর্ণকার প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর জন্য স্বহস্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বর্ণলঙ্কার গড়িয়া যে মহানন্দ প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণকিশোরের মনে সেই চিত্তপ্রসাদের সেই মহানন্দেরই সঞ্চার হইয়াছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পত্র কোথায় গেল ?

সতীর্থ-বন্ধু শ্রীমান উমাপদ বসুকে কৃষ্ণকিশোর যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল ? এস, আমরা তাহার অনুসন্ধান করি। কৃষ্ণকিশোর কলিকাতায় আসিয়া বুঝিয়াছিল যে বন্ধু কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় ঐ পত্র পায় নাই ; ইহা বুঝিয়া সে সেই পত্র সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে নাই ;—সেই জ্যোৎস্নাময়ীর চিন্তা ছাড়া এক্ষণে আর কোনও প্রকার চিন্তা করিবার অবসর তাহার ছিল না। কিন্তু আমরা সেই অত্যাবশ্যক পত্রের পশ্চাদনুসরণ করিব।

পত্রখানি তাজপুর ডাকঘরে চিঠিরবাক্সে কয়েক ঘণ্টা পতিত থাকিয়া, অন্য কতকগুলি পত্রের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া নিরাপদে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিল। পরে এক পিয়ন সহযাত্রী পত্রগণসহ একত্র করিয়া, উহাকে বাক্সের বাহিরে আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। টেবিলের একপার্শ্বে চর্ম্মসদৃশ এক খণ্ড রবারের দ্বারা বিরচিত ক্ষুদ্র একটি শয্যা বিস্তৃত ছিল। অন্যান্য সহযাত্রীর ন্যায় কৃষ্ণকিশোরের পত্র খানিকেও ঐ ক্ষুদ্র শয্যার উপর শায়িত করিয়া আর একজন পিয়ন উহার শ্বেত বক্ষে লৌহগঠিত মোহরের দ্বারা সজোরে নির্দ্দয় প্রহার করিয়া উহাকে

পোষ্ট অফিসের কৃষ্ণ নাম এবং খৃষ্টীয় তারিখ অঙ্কিত করিয়া দিল। তাহার পর দরিদ্র পোষ্টকার্ড এবং স্ফীতোদর ধনী পুলিন্দাগণের সহিত উহাকে এক চটরচিত থলিয়ার উদর মধ্যে পুরিয়া ফেলিল; এবং থলিয়ার মুখ চাবির দ্বারা বন্ধ করিয়া, পুনরায় সেই মুখে রজ্জু বাঁধিয়া, রজ্জুগ্রন্থিতে তপ্ত গালা লাগাইয়া, গালার উপর শীলমোহর করিল। তখন পোষ্টমাষ্টার বাবু আপনার কষ্টকর কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিয়া কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া শীল মোহর পরীক্ষা করিলেন। যথাকালে, দেবাদিদেব মহাদেবের পুটালি ও ত্রিশূল বাহী অনুচর শ্রীমান্ নন্দীর ন্যায়, 'রণার' নামক পুটালি ও বল্লমধারী একটি জীব বল্লম-নিক্কণ-নিনাদে পোষ্টাফিসের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পোষ্টমাষ্টার বাবু আবার তাঁহার কাষ্ঠাসন কষ্টে ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বয়ং সেই নন্দীরূপী রণারের অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীমান্ রণার পুঙ্গব নিক্কণনিনাদিত বল্লমসহ পুটালিটি পোষ্টমাষ্টার বাবুর চটি-চট্‌চটায়িত পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিয়া একটি টেবিলের পার্শ্বে উপবেশন করিল, এবং ক্ষীণ কটিতট হইতে গোলাপমাল্য তুল্য গামছাবন্ধন খুলিয়া তদ্দ্বারা আপন সুকৃষ্ণ মুখমধুরিমা মুছিল, ও তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব চামর রচনা করিয়া আপন কৃষ্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় বক্ষে ব্যজন করিল।

কিয়ৎকাল পরে একজন পিয়ন তাহাকে নিভৃতে লইয়া তাহার হস্তে প্রজ্জ্বলিত তামাকুপূর্ণ কলিকাটি প্রদান করিল, রণার প্রবর দুইটি কৃষ্ণ ও দৃঢ় করপুটে এক অপূর্ব্ব হুকা

রচনা করিয়া, তন্মধ্যে কলিকাটি সংস্থাপিত করিয়া, মদ্যপানাতুরের ন্যায়, মহা আগ্রহে ধূমপান করিল। ইত্যবসরে অন্য পিয়ন তাঁহার বল্লমের অগ্রভাগ হইতে ডাকের আগত থলিয়াটি খুলিয়া লইয়া, উহাতে পূর্ব্ব বর্ণিত তাজপুরের থলিয়াটি বাঁধিয়া দিল। আরও কয়েক মিনিট পরে রণার আবার আপনার গামছা বন্ধনে কটিতট বাঁধিয়া, থলিয়ার সহিত বল্লমটি স্কন্ধে লইয়া ঝুণু ঝুণু বোলে রেলষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইল।

যথাকালে রেল ষ্টেসনে নিয়মিত ট্রেণ আসিল। থলিয়াটি ট্রেণের রক্তবর্ণ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মেল সর্টারের (Mail sorter) হাতে পড়িল। মেল সর্টার যে স্থানের যে পত্র তাহা পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন থলিয়ার মধ্যে তাহা পুরিয়া ষ্টেসনে ষ্টেসনে নামাইয়া দিতে লাগিল।

কৃষ্ণকিশোরের পত্র যথা সময়ে কলিকাতায় পৌঁছিল। খাকী পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষধারী নাগরিক পিয়ন অন্যান্য পত্রের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া বিলি করিতে বাহির হইল।

সে অল্পকাল মধ্যে ৭৭ নং বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁকিল,—"বাবু উমাপদ বসু একটা চিঠি আছে।"

আমাদের পরিচিত সেই বামুনঠাকুর রান্নাঘর হইতে বলিল,—"উমাপদ বাবুর কলেজ বন্ধ হ'য়েছে; তিনি দেশে গেছেন।"

ডাক পিয়ন জিজ্ঞাসা করিল,—"দেশের ঠিকানা।"

বামুন ঠাকুর কহিল,—"দেশের ঠিকানা আমরা জানিনা।"

ডাক পিয়ন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ কালের মধ্যে ফিরবেন কি ?"

বামুন ঠাকুর বলিল,—"না। বোধ হয় দেড় মাস কি দুমাসের আগে ফিরবেন না।"

তখন ডাক পিয়ন পত্রের আবরণের পৃষ্ঠে পেন্সিলে লিখিল "মালিক হাজীর নাই"; অতঃপর সে পত্রখান, আপনার চর্ম্ম পেটিকার মধ্যে ফেলিয়া অন্যান্য পত্র বিলি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার পর যথাকালে পত্রখানি ডাকঘরে ফেরত দিল।

ঐ পত্র সম্বন্ধে কয়েকদিন ডাক বিভাগীয় তদন্ত চলিল। তাহার পর ডাকবাবু উহাতে একটি unclaimed letter এর slip (চিরকুট) সংলগ্ন করিয়া, পত্রাবরণের বামপার্শ্বে কৃষ্ণ কিশোরের নাম দেখিয়া লিখিলেন,—

"Returned to
Babu Krisna kisor Sing,
Tajpure Post office.

ললাটে উল্লিখিত বিচিত্র বিজয় পত্র ধারণ করিয়া, তিন চারিটি মোহরাঙ্কিত পত্রখানি আবার তাজপুরের ডাকঘরে ফিরিয়া আসিল। তাজপুর ডাকঘরের ডাকপিয়ন বাগান বাড়ীর কাছারী ঘরে আসিয়া উহা গোমস্তার হস্তে সমর্পণ করিল।

তাহার পূর্ব্বদিন কৃষ্ণকিশোর পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণকিশোরের অভাবে গোমস্তা

সেই বিচিত্র পত্র গ্রহণ করিয়া কিছু চিন্তান্বিত মনে কত্রী ঠাকুরাণীর নিকট আসিল।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী পত্রখানি হস্তে তুলিয়া লইয়া উহার আবরণ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে কৃষ্ণকিশোর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে উমাপদ বসু নামক কোনও লোককে ৭৭ নং ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়াছিল; উমাপদ বসু ঐ ঠিকানায় না থাকায়, পত্র প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। মাতা ভাবিলেন, কিন্তু এই উমাপদ বসু কে? এবং তাহাকে কৃষ্ণকিশোর পত্র লিখিল কেন? মাতার যে স্নেহময় দৃষ্টি এযাবৎ পুত্রের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনের প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছে, তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া সে কিরূপে কখন এই পত্র লিখিল? মাতার মনোমধ্যে সহজেই নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। মাতা একবার মনে করিলেন, হয়ত উমাপদ বসু কৃষ্ণকিশোরের কলেজের কোন সহাধ্যায়ী বা অধ্যাপকের নাম; হয়ত পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সে তাহাকে পত্র লিখিয়া ছিল। এই পত্র বিলি না হওয়ায় এবং তজ্জন্য উহার কোনও উত্তর না আসায়, বুঝি, সে নিজেই কলিকাতায় গিয়াছে। কিন্তু আপনার মানসিক প্রশ্নের এই মানসিক সমাধান দ্বারা একমাত্র পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতা সন্তুষ্টা থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ঐ পত্র মধ্যে এমন কোনও কথা আছে, এমন কোনও গোপন অভিলাষের কথা প্রকাশিত আছে, যাহা সে লজ্জা ভয়ে মাতার নিকট

প্রকাশ করিতে পারে নাই। সেই অভিলাষটি কি, তাহা হয়ত, এই পত্র খানা আবরণোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে। সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য অথবা তাহা দুষ্ট হইলে তাহা দমন করিবার জন্য যে কোনও উপায়ে অভিলাষটি কি তাহা জানা মঙ্গলার্থিনী মাতার কর্ত্তব্য। ফলতঃ অন্যের পত্র পাঠ করা—সে অন্য জন আপন গর্ভজ পুত্র হইলেও যে অন্যায় কর্ম্ম এই বিজাতীয় নীতিটি অন্যান্য বঙ্গ ললনার ন্যায় তিনিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না।

অতএব কতকটা ঔৎসুক্য লইয়া, কতকটা পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিবার লালসা লইয়া, এবং কতকটা বিজাতীয় নীতিজ্ঞান বিহীনা হইয়া আগ্রহময়ী স্নেহময়ী মাতা পুত্রের লিখিত পত্র খানা আবরণোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন।

এই পত্রে কি লিখিত ছিল, তাহা তোমরা অবগত আছ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

গোমস্তার দুশ্চিন্তা।

মাতা কৃষ্ণকিশোরের পত্র পাঠ করিয়া মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"ওরে বাছা! রাধাকিশোরের বিয়ে দেখে তোরও একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে গেছে! তা, আমি তোর বিয়ে দেব; তোর সেই পছন্দ করা মেয়ে যদি কায়েতের মেয়ে হয়, তবে তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। কিন্তু ওরে দুষ্টু! তুই সেকথাটা তোর মার কাছ থেকে লুকাতে চাইলি কেন? এর জন্যে কিন্তু আমি তোকে একটু জব্দ করবো।"

মনে মনে একটা মৎলব স্থির করিয়া তিনি পরদিন প্রভাতে উঠিয়া একখানি পঞ্জিকা লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত কি দেখিলেন। তাহার পর, বৃদ্ধ গোমস্তাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

গোমস্তাকে সমাগত দেখিয়া কর্ত্রী কহিলেন,—"দাঁড়াও, একটা বিশেষ কাযে তোমাকে আজই কলকাতায় যেতে হ'বে।"

গোমস্তা। কিন্তু, মা, ছোটবাবু মশায় বাড়ী বিক্রীর কোবালা খানা আজ রেজিষ্টারি করে দেবেন বলে আজ আমার জেলায় যাবার কথা ছিল।

কর্ত্রী। কিন্তু জেলায় যাওয়ার চেয়ে, কলকাতায় যাওয়া বেশী দরকার হ'য়ে পড়েছে।

গোমস্তা। কলকাতায় কখন যেতে হ'বে?

কর্ত্তা। এখনই। এখন ক'টা বেজেছে?

গমস্তা। এখনও সাতটা বাজেনি।

কর্ত্তা। তাহলে তুমি পোনে আটটার গাড়ী অনায়াসে ধরতে পারবে। পোনে আটটার গাড়ী ধরতে পারলে, তুমি কখন কলকাতায় পৌছতে পারবে?

গমস্তা। বোধ হয় এগারটা বাজবে।

কর্ত্তা। বেশ, ঐ সময় তুমি শেয়ালদা ষ্টেসনে কিছু জলখাবার খেয়ে, নিয়ে ** ষ্ট্রীটে যাবে। ঐ ষ্ট্রীটে ৭৭ নম্বর বাড়ী খুঁজে নেবে। ৭৭ নম্বর বাড়ীতে ঢকতে হ'বে না। ঐ ৭৭ নম্বর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটা সরু গলি দেখতে পাবে। ঐ গলির দক্ষিণ দিকে একটা তেতলা বাড়ী দেখতে পাবে। প্রথমে ঐ তেতলা বাড়ীর নম্বরটা জেনে নেবে; বোধ হয়, সেটা ৭৬ কি ৭৮ নম্বর বাড়ী হ'বে। তার পর কোনও রকমে ঐ বাড়ীর কর্ত্তার নাম জেনে নেবে; আর তাঁর অন্যান্য পরিচয়ও সংগ্রহ করবে।

গোমস্তা। এসবই আমি করতে পারবো।

কর্ত্তা। দাঁড়াও, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। সেই বাড়ীর কর্ত্তা যদি কায়স্থ ছাড়া অপর কোনও জাতি হ'ন, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে, আজই তাজপুরে ফেরত এসে আমাকে সে সংবাদ দেবে।

গোমস্তা। আর তিনি যদি আমাদের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ হ'ন?

কর্ত্রী। ভালই ; উত্তর রাঢ়ী হ'লেও ক্ষতি হ'বে না। তাঁকে কায়স্থ বলে জান্‌তে পারলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তার পর, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে যে, তাঁর বিবাহযোগ্যা এক মেয়ে আছে। সেই মেয়ের সঙ্গে আমি কৃষ্ণকিশোরের বিয়ে দিতে চাই।—বুঝলে ?

গোমস্তা। কিন্তু বিয়ের আগে মেয়েটিকে একবার স্বচক্ষে——

কর্ত্রী। না, মেয়েটিকে আমাদের দেখবার দরকার নেই। তুমি মেয়ের বাপকেও সেই কথাই বলো। আগামী আষাঢ় মাসের ১৩ তারিখে শুভ দিন আছে ; সেই দিনই আমার বিয়ে দেবার ইচ্ছা, একথাও বলে এসো। আর তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে কৃষ্ণকিশোরের বিদ্যাবুদ্ধির কথা, তার আর্থিক অবস্থার কথা, তার রূপগুণের কথা, যেমন তুমি জান, সব ঠিক ঠিক বলো ; একটুও বাড়িয়ে বলো না। তারপর সকল কথা শুনে যদি তিনি কৃষ্ণকিশোরকে দেখতে চান, তাঁকে পাঁচ ছ'দিন বাদে এখানে আসতে বলো।

গোমস্তা। আর দেনা পাওনার কথা ?

কর্ত্রী। দেনা পাওনার কথা কিছুই বলবে না।

গমস্তা। মেয়ের বাপ যদি জিজ্ঞাসা করেন ?

কর্ত্রী। তাহলে বলবে যে তিনি অনুগ্রহ করে যা দেবেন তাই তাঁরে দেনা, আর তাই আমাদের পাওনা ; তাঁর মেয়েটিকে ছাড়া আর আমরা কিছুই চাইনে। তার সঙ্গে কথাবার্তার সময় তুমি একটা কথা বিশেষ করে মনে রেখো যে, যেমন করে

নরক

পারি আমি সেই মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণকিশোরের বিয়ে দেবই; আর সে বিয়েটা ঐ ১৩ই আষাঢ় তারিখেই হ'বে। তুমি আজই সন্ধ্যার আগে ফেরত এসে আমাকে সকল খবর দেবে।

গোমস্তা। কিন্তু, মা, কলকাতায় যাওয়াটা একদিন পেছিয়ে দিলেও ত চল্‌ত। আমার ইচ্ছা হ'য়েছিল যে ছোটবাবু মহাশয়ের সঙ্গে জেলায় গিয়ে, বাড়ী বিক্রির কোবালা খানা স্বচক্ষে দেখে শুনে ঠিক করে নিই; এসব কাজ একটু দেখে শুনে নেওয়া ভাল।

কর্ত্রী। সে বিষয়ে তোমার কোনও ভাবনা নেই। একটা কথা তুমি ভুলে যেয়ো না। ছোট বাবু আর যাই হউন না কেন, তাজপুরের জমীদার গোষ্ঠীতে তাঁহার জন্ম, তিনি স্বেচ্ছায় কখনও কাউকে প্রবঞ্চনা করবেন না। আর তাঁর কৃষ্ণকিশোরকে কর্ত্তা নিজে স্বর্গ থেকে রক্ষা করছেন; চেষ্টা করলেও, এই পৃথিবীতে কেউই তাকে ঠকাতে পার্ব্বেনা। এখন তুমি আর কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট করো না। খরচ পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

গোমস্তাকে বিদায় দিবার পর, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মনে পড়িয়া গেল যে সেই কন্যা এখনও অবিবাহিতা আছে কিনা কৃষ্ণ-কিশোরের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কন্যা যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে ত গোমস্তাকে কোনও উপদেশ দেওয়া হইল না। এতএব তিনি গোমস্তাকে পুনরায় আহ্বান করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই

তাহার আশা-প্রফুল্ল হৃদয়ে কে যেন মৃদু ও মধুর স্বরে বলিয়া গেল, না সেই কায়স্থ কন্যা বিবাহিতা হয় নাই ; সে কৃষ্ণকিশোরেরই বধূ হইবে। তিনি কাহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গোমস্তাকে আর ফিরাইলেন না।

গোমস্তা তাড়াতাড়ি স্নান সনাপন করিয়া, একটু গুড়জল মুখে দিয়া রেল ষ্টেসনের দিকে ছুটিল। শিয়ালদহের টিকিট কিনিল, ষ্টেসানে কলিকাতামুখা গাড়ী আসিলে তাহাতে আরোহণ করিল। কিন্তু এ কার্য্যে, সে নানারূপ দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না। সত্য বটে, কর্ত্রীঠাকুরাণী যখন তাহাকে এইকার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন সে তাঁহার অদ্ভুত আদেশের প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস সংগ্রহ করিতে পারে নাই ; কিন্তু এখন রেলগাড়ীর বেঞ্চের উপর বসিয়া বৃদ্ধ গোমস্তা ভাবিল যে, এবার তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ না করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছে।—আজীবন যাঁহাদের লবণ খাইয়াছে, তাঁহাদেরই অনিষ্ট করা হইয়াছে। কর্ত্রীঠাকুরাণী এযাবৎ আপন বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া কখনও ঠকেন নাই বটে ; কিন্তু এইবার এইরূপ অদ্ভুত ভাবে পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চয়ই ঠকিবেন। যাহার নামটি পর্য্যন্ত অবগত নহেন, যাহার জাতি বা বংশমর্য্যাদা অবিদিত, অবিবাহিতা কন্যা আছে কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে, তাহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে যাইলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। আজ প্রভাতে উঠিয়া তাঁহার মাথায় কেন এই দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল, তাহা অন্তর্য্যামীও বলিতে পারেন

না। কন্যাকে না দেখিয়া তাহার সহিত একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী কি গর্হিত কার্য্যই করিতেছেন। সে যদি কুৎসিতা হয়, এবং তজ্জন্য পুত্র যদি তাঁহার প্রতি অনুরাগী না হয়, তাহা হইলে কর্ত্রীঠাকুরাণী জীবনে আর কোনও শান্তিই লাভ করিতে পারিবেন না। তাহার উপর, আবার বিবাহে কিছুই যৌতুক লইবেন না ;—তাঁহারা যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন ; না !—এই কলিকালে মোচড় না দিলে কি লোকে কিছু দেয় ? বৃদ্ধ গোমস্তা নিশ্চয় জানিত যে, তাহার বালক প্রভু ছোটবাবু মহাশয়ের পুত্রগণ অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ পাত্র ; ছোটবাবুর চারি পুত্র একুনে যে সম্পত্তি পাইবে, তাহার বালক প্রভু একা তাহার দ্বিগুণ সম্পত্তীর অধিকারী হইবে ; তাহার প্রভু ছোটবাবুর পুত্রগণ অপেক্ষা সুরূপ, সুশীল, কর্ম্মঠ এবং অধিক বিদ্যাধিকারী। ছোটবাবু যদি পুত্রের বিবাহ দিয়া দশহাজার টাকা লইতে পারেন, তাহা হইলে, তাহার প্রভুর বিবাহে বিংশতি সহস্রেরও অধিক পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব ! কর্ত্রী ঠাকুরাণী আজ প্রভাতে উঠিয়া আকস্মিক দুর্ব্বুদ্ধির বশে আপনার ও পুত্রের কি ক্ষতিই করিয়া ফেলিলেন ! তাঁহার এই অযথা আদেশের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, কিন্তু গোমস্তা আপন মনোমধ্যে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিল যে, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করা চলে না ; এবং তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া তাঁহার আদেশ অমান্য করাও একেবারে অসম্ভব !—তাঁহার

আদেশগুলা যেন প্রতিপালিত হইবার জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুশ্চিন্তায় সময়াতিবাহিত করিয়া গোমস্তা বেলা এগরটার শিয়লদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল; এবং তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া, ছেয়াত্তর বা আটত্তর নম্বরের অনুসন্ধানে বাহির হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহিণীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি।

ঠিক সেই সময়ে ইঞ্জিনিয়ার বাবু আপন বাটীতে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি কন্যা মোক্ষদার জন্য সৎপাত্র অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ছয়মাসের অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে অবকাশ কাল এখনও শেষ হয় নাই। এইজন্য তিনি বেলা দশটার পূর্ব্বে আহার না করিয়া, বেলা এগারটার সময়ই আহার করিতে বসিতেন।

বামুনঠাকুর নামধারী একজন উড়িষ্যাদেশবাসী, একটা কাংস্যস্থালীতে অন্ন, এবং কৃষ্ণ, কপিশ, পিঙ্গল প্রভৃতি নানা বর্ণের, সুশীতল বা অত্যুষ্ণ, বহুলবণাক্ত বা লবণহীন, স্নেহসিক্ত বা তৈলহীন ব্যঞ্জনোপকরণসকল সজ্জিত করিয়া, তাঁহার আসন সমক্ষে রক্ষা করিল। কন্যা মোক্ষদা কুঁজায় জল ও বরফ পূর্ণ করিয়া, এবং কুঁজার মুখে একটি রজত নির্ম্মিত পানপাত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া, ইঞ্জিনিয়ার বাবুর আসনের বামপার্শ্বে রক্ষা করিল; এবং নিকটে তালবৃন্ত আনিয়া সস্মিতমুখে পিতাকে ব্যজন করিতে বসিল।

গৃহিণী শান্তিময়ী স্নানকক্ষে ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার বাবুর আহার অর্দ্ধসমাপ্ত হইলে তিনি সুগন্ধী সাবান ও গন্ধতৈলের

সৌরভ ছড়াইয়া, সজল মুক্তকেশাগ্রে গ্রন্থি বাঁধিতে বাঁধিতে স্বামীর আহার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্নানস্নিগ্ধ পত্নীর অনবদ্য কান্তি দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার বাবু মুগ্ধ হইলেন; এবং আশান্বিত হৃদয়ে মনে করিলেন যে, আজ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে আহার সমাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা অন্যপ্রকার বিধান লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

গৃহিণী ইঞ্জিনিয়ার বাবুর খাদ্য পাত্রের নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ওমা! আজ তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? মেয়ের সঙ্গে অত বক্‌বক্ ক'রে বক্‌লে খাওয়া ত এ জন্মে শেষ হ'বে না।

ইঞ্জিনিয়ার বাবু। তা' খাওয়াটা আগামী জন্ম পর্যন্ত চলে, মন্দ হয় না। কিন্তু কই, আমি ত মোক্ষদার সঙ্গে একটা কথাও কইনি। কেবল ওর পাখার বাতাস বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে ব'লে, মনে মনে ওকে আশীর্ব্বাদ করছি।

গৃহিণী। স্থধু শুষ্কমুখে ঠক্‌ঠকে আশীর্ব্বাদ সবাই কর্ত্তে পারে। ওর বিয়েতে ওকে হীরা মুক্তা দিয়ে সাজাতে পারতে, তবে বুঝতাম ওর দিকে তোমার টান আছে।

বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই মোক্ষদার হৃদয়মধ্যে কাহার চন্দ্রালোকিত দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়িত; তখন অন্য বিবাহের কথা তাহার ভাল লাগিত না। মাতার কথা শুনিয়া সে বিরক্ত হইয়া মনেমনে কহিল,—"ছাই বিয়ে! ছাই হীরা মুক্তো।" কিন্তু তাঁহার মনের বিরক্তভাব তাহার শান্ত স্নিগ্ধ মুখে প্রকাশিত হইল না।

সেই শান্ত ও স্নিগ্ধ মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু সস্মিত মুখে কহিলেন,—"সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা। বল্ ত মা, তোর দিকে আমার টান আছে কিনা? আর সে টানটা তোর গঙ্গার টানের চেয়ে বেশী টান কি না? আর বল্ ত মা, তোর বাবার আশীর্ব্বাদটা হীরামুক্তার গহনার চেয়ে ভাল কি না?"

মোক্ষদা পিতার আশীর্ব্বাদই চায়; আর চায়, সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে, সেই নাথ......। সে আপনাকে সংযত করিল। ছি, ছি! তাহার মত অনূঢ়া কিশোরীর পক্ষে এক অজানিত পুরুষের পরিণয় কামনা যে মহাপাপ! সে আপন বক্ষের লজ্জা লইয়া আনত আননে বসিয়া রহিল; পিতার বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিল না।

গৃহিণী তাহাকে উত্তর দিবার অবসরও প্রদান করিলেন না; তিনি তাড়াতাড়ি কহিলেন,—"নাও, নাও, থামো; আর রসিকতায় কাজ নেই। মেয়ে চৌদ্দ বছরের ধাড়ী হ'ল; এখনও ওর বিয়ে দিতে পারলে না; ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা হ'চ্ছে না?"

মোক্ষদা মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"মা তুমি বাবাকে আমার বিয়ের কথা কেন বল! আমি ত বিয়ে করতে চাচ্ছিনে।"

গৃহিণী কহিলেন,—"চাইলেই বা তোর বিয়ে দিচ্ছে কে? তোর আছে কে, যে তোর জন্যে একটা সৎপাত্র খুঁজে দেবে? একটা ভাল পাওয়া গিয়েছিল, তা যে রকম গড়িমসী করছে সেখানে যে বিয়ে হয় এমন বোধ হয় না।"

ইঞ্জিনিয়র বাবুর সস্মিত মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"ওর বিয়ে দেবার লোক আছে; ওর বাবাই ওর বিয়ে দেবে। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি সৎপাত্র খুঁজে বার করবই; আর একমাসের মধ্যে ওর বিয়ে দেবই। আমি আজই রওনা হ'ব; যদি এই মাসের মধ্যে সৎপাত্র খুঁজে বার করতে না পারি, তা'হলে, সত্যি বলছি, আর কখনও তোমাকে মুখ দেখাব না।"

পবন স্পর্শে স্থির মুকুরোপম সরোবর সলিল যেমন তরঙ্গিত হইয়া উঠে, ইঞ্জিনিয়র বাবুর বাক্যে, একটা দারুণ সন্দেহের আন্দোলনে গৃহিণীর স্নানস্নিগ্ধ ললাটতল তেমনই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; তিনি আপনার কৃষ্ণভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, তীক্ষ্ণ নয়নে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কেন, আবার পাত্র খুঁজতে বেরুবে কেন? তাজপুরের সেই জমীদারের ছেলেটির সঙ্গে যে বিয়ের কথা হ'চ্ছিল, তার কি হ'লো?"

ইঞ্জিনিয়র বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—"সেখানে বিয়ে হ'বে না।"

'বিয়ে হবে না'—এই কথাটায় মোক্ষদার মন হইতে যেন একটা মহাভার সরিয়া গেল।

গৃহিণী কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? তুমিই ত ছেলে দেখে এসে বলেছিলে যে, ছেলেটি দেখতে শুনতে আর লেখাপড়ায় সব রকমেই ভাল। তার উপর, তার বাবা মস্ত জমীদার। তাদের রাজবাড়ীর মত প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, তার

উপর চমৎকার বাগান বাড়ী আছে। তাদের বাড়ীতে খুব ধুম-ধাম করে দোল দুর্গোৎসব হয়। এসব ত তুমিই দেখে শুনে এসে বলেছিলে। আর তারা এসেও মেয়ে দেখে খুব পছন্দ করে গেছেন। এখন, সেখানে মেয়ের বিয়ে দেব না কেন, শুনি?"

ইঞ্জিনিয়র বাবু আবার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমার ত সেই খানেই বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল, তা তাঁরা দিলেন কই?"

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ হইল; কহিলেন,—"কেন দিলেন না? মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেলেন; তবে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন না কেন?

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া এবং তাহার মুখমণ্ডলের রোষের রৌদ্ররাগ দেখিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু ভীত হইলেন; মনে করিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া তাঁহার শান্তিময়ী, তাঁহার গৃহের গৃহিণী, শান্ত গৃহ মধ্যে এই নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নে এমন একটা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন যে তদ্দ্বারা কেবলমাত্র বহির্গাত্র নহে, কিন্তু সমস্ত গৃহস্থের অন্তস্তলও দগ্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ অগ্নিকাণ্ড ইঞ্জিনিয়র বাবু বহুবার অবলোকন করিয়াছিলেন। তাই প্রিয়তমার বদন-গগনে সিন্দূর রাগ দেখিয়া তিনি 'ঘরপোড়া গরুর' ন্যায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি তাঁহাকে পত্নীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"দেনা পাওনা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হ'ল না, তাই তারা বিয়ে দিলেন না।"

সুধামুখী গৃহিণী মধুর কণ্ঠরব তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া এবং ইন্দীবরাক্ষের কটাক্ষ তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেমিলটা কিসে হ'ল, শুনি ?"

ইঞ্জিনিয়র বাবু কণ্ঠস্বর মৃদু হইতে মৃদুতর করিয়া কহিলেন,— "তাঁরা নগদ পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক চেয়েছিলেন ; কিন্তু আমার সঙ্গতি না থাকায় আমি দু'হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হইনি।"

গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"মোটে তিন হাজার টাকার জন্যে ? কেন, তুমি কি কোথাও কারও কাছ থেকে, তিন হাজার টাকাও ধার পেতে না ? এমনই অপদার্থ তুমি ! আমি কিন্তু বলে রাখছি, যেমন করে হ'ক—ধার ক'রে, চুরি ক'রে হ'ক, সেই খানেই মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, আমার ঐ একটা মেয়ে ! দু'বছরের নয়, পাঁচ বছরের নয়, তোমার তিন মাসের আয় তিন হাজার টাকা ! সেই তিন হাজার টাকার জন্যে তুমি ঐ একটা মেয়েকে অমন একটা সৎপাত্রের হাতে দিতে পারবে না !—একথা মুখ দিয়ে বার করতে তোমার লজ্জা হ'ল না ; টাক্‌রা থেকে জিভ খসে পড়ল না ? ছি ! ছি ! ভাল চাও যদি তুমি এখনই ভাত খেয়ে উঠে তিন হাজার টাকা ধার করে নিয়ে এস। আর এখনই তাদের লিখে দাও যে পাঁচ হাজার টাকা দিতেই তুমি রাজি আছ।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু তাঁহার মৃদু স্বর একটু দৃঢ় করিয়া কহিলেন,— "আমি ত পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি নই, তবে সে কথা

লিখব কেন? আর টাকা ধার ক'রেও আমি মেয়ের বিয়ে দেব না; একথাটা তুমি নিশ্চয় জেনে রেখ'। তা' ছাড়া অন্ত জায়গায় সে পাত্রের বিয়ে হ'য়ে গেছে, সেখানে আর বিয়ে দেবার উপায় নেই।"

পিতার কথায় মোক্ষদার আপন গোপন হৃদয় মধ্যে যেন একটা মহামুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।—বুঝি বা সে মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, যেন তাহাকে বিবাহ করিবার আগে অন্য সকল পাত্রেরই বিবাহ হইয়া যায়।

স্বামী-দেবতার বাক্যে কিন্তু গৃহিণীর মনোমধ্যে প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই বার তাঁহার সুধামুখ হইতে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত যে বাক্যসুধা বর্ষিত হইল, তাহা তোমাদিগকে শুনাইতে আমার লজ্জা বোধ করিতেছে। হিন্দু নারী, তোমরা স্বামীকে গুরুর অধিক, দেবতার অধিক বলিয়া পূজা করিয়া থাক, সে সকল বাক্য তোমাদের শ্রবণযোগ্য নহে। ইঞ্জিনিয়র বাবুর প্রিয়তমা পত্নী দারুণ ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বামীর প্রতি যে কুলিশ কঠোর বাক্যসকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে, তোমাদিগের কোমল ও পবিত্র শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যথিত হইবে, কলুষিত হইবে। যে পবিত্র দেশে যজ্ঞধূমসৌরভময় আকাশে দক্ষনন্দিনীর প্রাণ বায়ু বিলীন হইয়াছে, সাবিত্রীর পবিত্র শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, যে দেশের সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ অভ্রান্ত ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন—

"ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ,"

যে দেশে পতির মৃতদেহের সহিত সতীর আত্মদাহ কঠিন রাজাজ্ঞাদ্বারা নিবারিত করিতে হইয়াছে, তোমরা চিরগৌরবময়ী হিন্দু ললনা, তোমরা সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তোমাদের জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' করিয়াছ,—যে অস্বাভাবিকা ভারতনারী আত্মহারা হইয়া স্বামীর প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে, ছি, ছি! তাহার কথা তোমরা কিরূপে শ্রবণ করিবে?

মোক্ষদা দাঁড়াইয়া সে বাক্য শ্রবণ করিতে পারিল না; সে সজল নয়নে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

যাইবার সময়, সে শুনিয়া গেল, মাতা বলিতেছেন,—"যা, যা, গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যা; যার বাপে বিয়ে দিতে পারে না, তার মরাই ভাল।"

ইঞ্জিনিয়ার বাবু অন্তর্দাহে অধীর হইয়া অন্নপাত্র ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীর দিকে ছুটিলেন। সেখানে— — —কিন্তু সে কথা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আমরা ক্রন্দমানা মোক্ষদার অনুসরণ করিব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মোক্ষদার দুরভিসন্ধি।

মোক্ষদা ত্রিতলে আপন শয়নকক্ষে যাইয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, বসনাঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া কিয়ৎকাল কাঁদিল। তাহার পর, ক্রন্দনরক্ত সজল লোচনপ্রান্ত অঞ্চলপ্রান্তে মার্জ্জিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। সে নিতান্ত বালিকা নহে, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, শিক্ষিতা, নাটক-উপন্যাস-সংবাদপত্রাদিতে দীক্ষিতা, বুঝিবা কিঞ্চিৎ প্রেমিকা কিশোরী। সে হয়ত আধুনিকা বালিকগণের মত স্বাধীনভাবে আপনার কথা আপনিই ভাবিতে শিখিয়াছিল।

সে পিতা ও মাতার বাক্যগুলি বিচার করিয়া ভাবিল, তাদের বাড়ীতে কেন আজ অশান্তির ঝড় উঠিল? তাহার ধর্ম্মভীরু অর্জ্জনশীল পিতা কেন আজ দু'টি অন্ন মুখে দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না; তাহার সেই স্নেহময় পিতা, তিনি কোনও দোষেই দোষী হইতে পারেন না। আর তাহার মাতা!—মাতৃভক্তির প্রতিমূর্ত্তি মোক্ষদা মায়েরও কোন দোষ দেখিল না। সে বুঝিল যে সে নিজেই দোষী;—সে নিজেই সংসারে শান্তিপথের একমাত্র কণ্টক। তাহারই জন্য তাহার পরমারাধ্য পিতা চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশে যাইতে চাহিতেছেন;

তাহারই জন্য তিনি তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন; তাহারই জন্য আত্মহারা হইয়া মাতা পতিপরায়ণতা ভুলিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষদা মনে মনে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে শত শত নরকের পাপ লইয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল? সে যদি না জন্মাইত তাহা হইলে আজ তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই বলিয়া পিতা, মাতা কর্ত্তৃক কঠিন দুর্ব্বচণ দ্বারা তিরস্কৃত হইতেন না; মুখের অন্ন ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া যাইতেন না; বলিতেন না এই মাসের মধ্যে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারিলে আর বাটীতে মুখ দেখাইবেন না। হায়, হায়! সেই সংসারের যত অনিষ্টের মূল! পাপ, পাপ! কণ্টক, কণ্টক! ভগবান এ পাপকে, এ কণ্টককে, এ সংসার হইতে বিদূরিত কর। অথবা, ভগবানের বুঝি সে শক্তি নাই;—মহাশক্তিধরের বাহুতে পাপ দূর করিবার ক্ষমতা নাই। মোক্ষদা ভগবানে বিশ্বাস হারাইল; ভগবানের শক্তিতে তাহার অস্থা রহিল না।

সাবধান, মোক্ষদা, ভগবানের অমোঘ শক্তিতে অবিশ্বাস করিও না। তুমি বালিকা, তুমি জান না যে, আমরা যখন সেই সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয় হারাই, তখন আমাদের হৃদয় হইতে ধর্ম্মের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যায়; বন্ধনচ্যুত হৃদয়টা বাত্যাতাড়িত তরণীর ন্যায়, অন্ধকারময় অজ্ঞানতার তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে ভাসিয়া যায়। আমরা তখনই হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলি।

বালিকার তরুণ উদ্দাম হৃদয় সময়ে সাবধান হইতে পারিল

না। তাহার হৃদয়ে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাসকল উদিত হইতে লাগিল।

সে কয়েক দিন পূর্ব্বে এক বালিকার আত্মবলিদানের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। সেই বালিকা তাহারই মত অবস্থায় পতিত হইয়া, আপন পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া, চিরকালের জন্য পিতামাতার দুর্ভাবনা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সংবাদপত্রে সংবাদপত্রে তাহার অপূর্ব্ব আত্ম-বলিদান কাহিনী অপূর্ব্ব বিজয়বার্ত্তার ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছিল। সেই আত্মঘাতিনী বালিকার সুখ্যাতিতে সমস্ত বাঙ্গালার মুখ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বালিকার স্বর্গীয় জ্বালাময়ী মূর্ত্তি আজ মোক্ষদার বক্ষোমধ্যে অগ্নিময়ী দেবীপ্রতিমার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল যে, শক্তিহীন ভগবান যে অমঙ্গলকে, যে কণ্টককে বিদূরিত করিতে পারেন নাই, সে নিজেই তাহা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিবে; আত্মহত্যা করিয়া মাতাপিতার শান্তির পথ হইতে কণ্টক বিদূরিত করিবে।

ছি, ছি! অবোধ বালিকা! সে ত বুঝিল না যে, তাঁহাদের অর্থাভাবে তাহার সুপাত্র যুটে নাই বলিয়া আত্মহত্যা করিলে, পিতামাতার অন্তর ভেদ করিয়া যে যন্ত্রণাময় কঠিন শেল চিরদিনের জন্য বিদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহা তাহার ন্যায় সহস্র কণ্টক অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর। তাহার বিবাহ দিতে না পারিয়া তাহার পিতার মনে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হইয়াছে

তজ্জন্য তাহার আত্মহত্যায় তাহা সহস্রগুণ যন্ত্রণাময় হইয়া দাঁড়াইবে। হয় ত সে মহাক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার জীবনতন্তু অকালে ছিন্ন হইয়া যাইবে। ছি, ছি! মোক্ষদা! তুমি যে পিতার প্রতি ভক্তিময়ী, যে পিতার ক্ষুদ্র অসুবিধা দূর করিবার জন্য অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া থাক, আজ সেই পিতার সেই জীবনান্তকারী মহাক্লেশের কথা কেন ভাবিয়া দেখিলে না?

সংবাদপত্রে যে অবোধ বালিকার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, সে কি উপায়ে আত্মহত্যা করিয়াছিল, মোক্ষদা তাহাও পাঠ করিয়া শিখিয়া রাখিয়াছিল। মোক্ষদা স্থির করিল যে, সেই শিক্ষিত উপায়েই আপন তরুণ দেহ দগ্ধ করিয়া আপনার প্রাণনাশ করিবে।

অতঃপর সে আপন চিত্তকে সাধ্যমত দৃঢ় করিয়া, পিতাকে এক পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু একার্য্যে সে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটা নিতান্ত অবাধ্য হইয়া ধারার পর ধারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, তাহার চিত্তের দৃঢ়তা বার বার ভাসাইয়া দিতে লাগিল। অঞ্চলপ্রান্তে সেই বিগলিত গণ্ডপ্লাবিত অশ্রুধারা বার বার মার্জ্জিত করিয়া সে কোন ক্রমে পত্র-লিখন সমাধা করিল; এবং উহা আপন উপাধানতলে রক্ষা করিল। মোক্ষদার গাত্রে কয়েকখানি সামান্য অলঙ্কার ছিল। সে তাহা উন্মোচন করিয়া ঐ পত্রের সহিত রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া ঐ অলঙ্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত রাখিয়া দিল।

আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে আপন মনকে কিছু কঠিন করিল; তাহার স্থির নয়নে নয়ন-জল শুকাইয়া গেল। সে একবার উন্মাদরোগগ্রস্তার ন্যায় চারিদিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নিঃশব্দে নিম্নতলে নামিয়া আসিল।

তখন তাহার মাতা আহারাদি সমাধা করিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবার জন্য আপন শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন গৃহের অন্যান্য সকলের মধ্যে কেহ আহারে কেহ অন্যবিধ কার্য্যে মনো-নিবেশ করিয়াছিল। সুতরাং মোক্ষদার নিম্নতলে আগমন কেহই লক্ষ্য করিল না। সে অন্যের অলক্ষ্যে একটি ছোট বাল্‌তি সংগ্রহ করিল; এবং সিঁড়ির নীচে যে ক্ষুদ্রকক্ষে, কেরোসিন, রেড়ীর তৈল, মোমবাতি, পলিতা, চিম্‌নি দেশলাই প্রভৃতি দীপোপকরণ সকল রক্ষিত থাকিত, তাহাতে প্রবেশ করিয়া অনেকটা কেরোসিন বাল্‌তিতে ঢালিয়া লইল, এবং একটি দীপশলাকার বাক্স হস্তগত করিয়া পুনরায় নীরব পদক্ষেপে ত্রিতলে উঠিল। সেখানে আনলায় মলমল্ কাপড়ের একটা ওড়না ছিল; তাহা উত্তম রূপে কেরোসিন সিক্ত করিয়া, সে কেরোসিনের বালতি ও দেশেলাই সহ কম্পিত মন্থর পদে গৃহচ্ছাদের সিঁড়িগুলি একে একে অতিক্রম করিয়া ছাদে উঠিতে লাগিল।

উঠিতে উঠিতে একবার এক চন্দ্রকর-স্নাত দীর্ঘ ও সুন্দর মূর্ত্তির কথা তাহার স্মরণ পথে উদিত হইল। একটা নূতন

আবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দুই মাস পূর্ব্বে ছাদে উঠিয়া চন্দ্রালোকমধ্যে সে যে নয়নানন্দদায়ক দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, আজ আবার যদি সেই দেবোপম মূর্ত্তি অবলোকন করে? তাহার বক্ষঃ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; তাহার বিজড়িত চরণ-দ্বয় আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহার মনে হইল, সেই বলিষ্ঠ মূর্ত্তি যেন তাহার মৃত্যুর পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তার কি আপন পিতৃগৃহে চির অশান্তি, স্নেহময় পিতার চির লাঞ্ছনা দেখিবার জন্য সেই পাপ, আবর্জ্জনা পৃথিবীতেই থাকিয়া যাইবে? না, সে কখনই তাহা হইতে দিবে না। সেই পাপ, সেই আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিতেই হইবে। সে আপন কাল্পনিক আশঙ্কা মন হইতে বিদূরিত করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিল। সে ভাবিয়া দেখিল, কই, এই দুই মাসেরও অধিক সময় মধ্যে সে একবারও তাহাকে ছাদে বা গবাক্ষপার্শে বা বাটীর নিকটবর্ত্তী রাজপথে, অনেক বার খুঁজিয়াও দেখিতে পায় নাই, সে ত নিজেই বলিয়া গিয়াছিল যে সে এই বাড়ীতে বাস করে না; বিশেষতঃ প্রায় এক মাস যাবৎ ওবাটীতে ত কেহই বাস করিতেছে না;—সে কথা ত সে ও বাড়ীর ঝিয়ের মুখেই শুনিয়াছিল। তবে আজ কোথা হইতে, দ্বিপ্রহরের এই তপ্ত রৌদ্রে, কি সুখ উপভোগ করিবার জন্য সেই সুন্দর যুবক ছাদে আসিবে? আসিয়া কেন সে তাহার মৃত্যু নিবারণ করিবে?—সে মরিলে তাহার ক্ষতি কি? আর—আর আজ তাহার মৃত্যুদিনে যদি—যদি সে একবার

দেখা দেয়, তাহা হইলে, তাহাকে মোক্ষদা এজীবনে আর একবার দেখিবে ; কিন্তু সে তাহার আত্মহত্যা নিবারণ করিবার পূর্ব্বেই সে সব শেষ করিয়া ফেলিবে।—কেরোসিনে ভিজা ওড়না খানা গায়ে জড়াইতে তাহার এতটুকুও বিলম্ব হইবে না ; তাহার পর একটি দেশলাই জ্বালা!—আর সব জ্বালা শেষ হইয়া যাইবে! মাতাকে আর কন্যার বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হইবে না ; পিতাকে আর লাঞ্ছিত হইতে হইবে না ; আর—আর—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া মনে মনে কলঙ্কিত হইতেও হইবে না।—পিতামাতার মস্তক হইতে কন্যাদায়ের সমস্ত বোঝা নামিয়া যাইবে ; সেও অন্যকে বিবাহ করিবার বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।

এইবার মোক্ষদা দৃঢ় পদে ছাদে উঠিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গোমস্তা ও ইঞ্জিনিয়র বাবু।

ইঞ্জিনিয়র বাবু প্রাণাধিকা পত্নীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া, অন্নপাত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরবাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে সেখানে কে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কক্ষ মধ্যে সন্তর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, তিনি কিছু সংশয়ান্বিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

এই আগন্তুক কে তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ? সে তাজপুর হইতে আগত সেই গোমস্তা। সে বিনীতকণ্ঠে কহিল,—"আমি তাজপুর থেকে এসেছি। এই বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।"

ইঞ্জিনিয়র বাবুর সংশয় অপনীত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার বিস্ময় আরও বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি কহিলেন,—"তাজপুর থেকে এসেছ? এবাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করবে? কেন?—আমি এবাড়ীর কর্ত্তা।"

গোমস্তা জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়ের নাম?"

ইঞ্জিনিয়র বাবু কহিলেন,—"আমার নাম: অনাবন্ধু মিত্র।"

গোমস্তা গৃহকৰ্ত্তাকে স্বজাতি জানিয়া নমস্কার করিল।

ইঞ্জিনিয়র বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি তাজপুরের জমীদার বাড়ীথেকে আসছ?"

গোমস্তা ইঞ্জিনিয়র বাবুর অনুমান শক্তি দেখিয়া কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"আজ্ঞে, হাঁ। আমি সেখানকার জমীদার বাড়ী থেকেই এসেছি।"

গোমস্তা কেন আসিয়াছে; পুত্রের বিবাহ হইয়া যাইবার পর কি উদ্দেশে জমীদার বাবু আবার তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়াছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, ইঞ্জিনিয়র বাবু কিছু উদ্বিগ্নতার সহিত বলিলেন,—"কেন?"

গোমস্তা কহিল,—"আমি জমীদার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির করবার জন্য এসেছি।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—"কেন, আমি ত শুনেছি যে, সে ছেলের বিয়ে বোশেখ মাসেই হ'য়ে গেছে। তবে আবার কেন তাঁরা তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে গোমস্তা ইঞ্জিনিয়র বাবুর কথা সহজে অনুধাবন করিতে পারিল না। সে কিয়ৎ কাল বিস্মিত নেত্রে ইঞ্জিনিয়র বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কার কথা বলছেন? আমাদের বাবুর ত বিয়ে হয়নি।"

ইঞ্জিনিয়র বাবু মনে করিলেন যে, তাঁহার মনোনীত পাত্রের বিবাহ সম্বন্ধে হয়ত তিনি ভুল সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"বল কি? অরুণ বাবুর ছেলের বিয়ে হয়নি?"

গোমস্তা এখন কথাটা বুঝিতে পারিল। সে তখন ইঞ্জিনিয়র বাবুকে বুঝাইয়া বলিল,—"আজ্ঞে, অরুণ বাবুর বড় ছেলের

বিয়ে গত ২রা বোশেখ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি অরুণ বাবুর কাছ থেকে আসিনি। আমাকে কর্ত্রীঠাকুরাণী আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

ইঞ্জিনিয়ার। তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণী কে?

গোমস্তা। আপনি যে অরুণ বাবুর নাম করলেন, তাঁর এক জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন; তার নাম ৺ করুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়। তিনি তাজপুর জমিদারীর অর্দ্ধাংশের মালিক ছিলেন। আমার কর্ত্রীঠাকুরাণী ৺করুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বিধবা স্ত্রী। আমি তাঁরই উপদেশ মত আপনার কাছে এসেছি। তিনি শুনেছেন যে আপনার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে।"

ইঞ্জিনিয়র। হাঁ, আমার একটি কন্যা আছে। আর শীঘ্রই আমি তার বিয়ে দিতে চাই।

গোমস্তা। আমার কর্ত্রীঠাকুরাণীও ঐ কন্যার সঙ্গে শীঘ্রই তাঁর এক মাত্র পুত্রের বিয়ে দিতে চান। এখন আপনার মত হলেই হয়।

ইঞ্জিনিয়র। তাঁর ছেলেটি কি করে?

গোমস্তা। এই কল্‌কাতাতেই পড়েন। এবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছেন। বড় ভাল ছেলে; নিশ্চয়ই খুব ভাল করে পাশ হ'বেন। দেখতেও খুব ভাল। আপনি কবে ছেলে দেখ্‌তে যাবেন তা কর্ত্রীঠাকুরাণী জানতে চেয়েছেন।"

ইঞ্জিনিয়র। তাঁরা আগে এসে আমার মেয়েকে দেখে পছন্দ করুন, তার পর আমি ছেলে দেখ্‌তে যাব।

গোমস্তা। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আদেশ করেছেন যে তিনি মেয়ে দেখবেন না।

ইঞ্জিনিয়র। মেয়ে দেখবেন না? কিন্তু, আমার মনে হ'চ্ছে, বোধ হয়, অরুণ বাবুর মুখে তিনি আমার মেয়ের কথা শুনেছেন। তিনি যে তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ব'লে এই মেয়েকে নিজে দেখে গিয়েছিলেন।

গোমস্তা মনে মনে বুঝিল যে ইহাই সম্ভব। নতুবা তাহার কর্ত্রীর মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কখনই না দেখিয়া এই কন্যার সহিত একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মতা হইতেন না। কিন্তু বৃদ্ধ গোমস্তা জমীদারী সেরেস্তার পুরাতন লোক; সে সহসা আপনার মনের কথা প্রকাশ করিল না। কেবল মাত্র কহিল,—"কিন্তু তিনি সে কথা আমাকে বলেননি। অধিক কি, তিনি আপনার নাম পর্য্যন্ত জানতেন না। আপনার নাম ও জাতি জিজ্ঞাসা করে, আপনাকে কায়স্থ বলে জেনে, তার পর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করতে আদেশ করেছিলেন।"

ইঞ্জিনিয়র। তাঁকে বলবে যে আমি তাজপুরের জমীদার বাড়ীতে কন্যার বিয়ে দিতে একান্ত ইচ্ছুক। তবে——

গোমস্তা। আর কোনও প্রতিবন্ধক উত্থাপন করবেন না। কর্ত্রীঠাকুরাণী বিয়ের দিন স্থির করেছেন—আগামী ১৩ই আষাঢ়।

ইঞ্জিনিয়র। বুঝেছ, বিয়ের একটা দেনা পাওনা আছে; সেটা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত না হ'লে ঐ দিনেই বিয়ে হ'বে।"

গোমস্তা। দেনা পাওনা সম্বন্ধে আমার কর্ত্রীঠাকুরাণী আপনাকে যা বল্‌তে বলেছেন, সে রকম কথা এই বাঙ্গালা দেশে এই ঘোর কলিকালে কোন লোকেই বল্‌তে পারেন না। তিনি বলেছেন যে আপনি অনুগ্রহ করে কন্যাকে বা জামাতাকে যা দেবেন তাই আপনার দেনা, আর তিনি যা পাবেন তাই তাঁর পাওনা।

বিবাহের যৌতুক সম্বন্ধে পাত্রের জননীর এইরূপ অতি উদার প্রস্তাব শুনিয়া, বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য সদ্বিবেচক ব্যক্তি সহজেই ঐ উদারতার মধ্যে কোনও গুপ্ত অভিসন্ধির সন্ধান পাইতেন। তিনি আপনার বিপুল বুদ্ধি ও সীমাহীন সদ্বিবেচনা লইয়া সহজেই সন্দেহ করিতেন যে, ঐ উদার প্রস্তাবের অন্তরালে কোনও গোপন প্রহেলিকা প্রচ্ছাদিত আছে। হয়ত পুত্রের চরিত্র দোষ বা কুৎসিত পীড়া আছে, হয়ত পাত্রের মাতার কোনও কুৎসা প্রচারিত আছে, হয়ত সেই সকল কথা শুনিয়া অন্য কেহই ঐ পাত্রকে কন্যাদান করে নাই ! তজ্জন্যই বাহিরে একটা উদারতা দেখাইয়া পাত্রের সুচতুরা মাতা বিবাহ কার্য্যটা কৌশলে সম্পন্ন করাইয়া লইতে-ছেন ; ইহার পর যখন দৃঢ় বিবাহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার কোনও উপায়ই থাকিবে না, তখন কন্যাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া, কন্যার পিতার নিকট হইতে অশেষ বিধানে যৌতুকের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করিয়া লইবেন।

কিন্তু, আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ইঞ্জিনিয়র বাবু নিতান্ত অপদার্থ লোক ; তাঁহার সুবুদ্ধি বা সদ্বিবেচনা কিছুই ছিল না।

তিনি সন্দেহ করিতে জানিতেন না ; তিনি সকলকেই বিশ্বাস করিতেন। এজন্য তিনি পাত্রের জননীর উদারতাকে প্রচ্ছন্ন প্রবঞ্চনা বলিয়া সন্দেহ করিলেন না ; বরং তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। তিনি গোমস্তাকে কহিলেন,—"তোমার কর্ত্রীঠাকুরাণীকে ব'লো যে তাঁর এই অনুগ্রহ আমি জীবনে কথনো ভুলবো না। তিনি আমার মত কন্যাদায়গ্রস্তের আজ যে উপকার করলেন, দেবতারাও তেমন উপকার করতে পারেন না ;—আমি চিরকাল তাঁকে দেবীর মতই ভক্তি করবো, আমার মেয়ে তাঁর মত শ্বাশুড়ীর পদসেবা করে ধন্য হবে।"

গোমস্তা। তা'হলে আপনি কবে পাত্র দেখতে যাবেন ?

ইঞ্জিনিয়র। তাঁর মত দেবীর ছেলেকে দেখবার আবশ্যক হ'বে না ;—দেবীর ছেলে দেবতাই হয়, দানব হয় না। তিনি যদি আমার মেয়েকে না দেখে গ্রহণ করতে পারেন, আমিও না দেখে তাঁর ছেলেকে জামাই করতে পারবো। আমি কেবল ছেলেটির নাম জানতে চাই।

গোমস্তা। তাঁর নাম শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর সিংহ ; তিনি এবার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে ছাপ্‌বার জন্যে আপনার কন্যার নামটিও জানা আবশ্যক।

ইঞ্জিনিয়র বাবু কন্যার নাম বলিলেন। তাহার পর গোমস্তাকে কিছু জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। তিনি গোমস্তাকে আর

একটু অপেক্ষা করিয়া ভাত খাইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোমস্তা কোনও ক্রমেই তাহাতে সম্মত হয় নাই।

গোমস্তা বলিয়াছিল,—"এখানে ভাত খেতে হ'লে দেরী হ'য়ে যাবে; সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরতে পারবো না। কর্ত্রীঠাকুরাণী সন্ধ্যার আগেই তাঁ'কে সংবাদটা দিতে বলেছেন। তাঁ'র আদেশ অমান্য করা চলবে না।"

গোমস্তা প্রস্থিত হইলে, ইঞ্জিনিয়র বাবু মস্তক অবনত করিয়া বার বার ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"জয় জগন্নাথ! তোমার ইচ্ছায় আমি ঐ তাজপুরের জমীদার গোষ্ঠীতেই কন্যার বিবাহ দিব, এবং তোমারই ইচ্ছায় এই বিবাহ আরও ভাল হইবে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ছারপোকার উচ্ছেদে কৃষ্ণকিশোর।

আমাদের এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত চারিটি ঘটনা ঠিক এক সময়েই ঘটিয়াছিল। যে সময় গোমস্তা শিয়ালদহ রেল ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিয়া দোকানে জলযোগ করিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ই ইঞ্জিনিয়র বাবুর বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ই শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় জেলায় যাইয়া উকিলের কক্ষে বসিয়া বাটী বিক্রয়ের কোবালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আবার সেই সময়ই কৃষ্ণকিশোর বন্ধু উমাপদ বসুর শয্যায় বসিয়া সেই শয্যা হইতে ছারপোকা উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল।

সেই দিন কিছু পূর্ব্বে আহারাদি সমাধা করিয়া কৃষ্ণকিশোর ভাবিল যে আর এক দিন কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া রাধাকিশোর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে পর দিন বাটী যাইবে, কিংবা সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে বাটী ফিরিয়া মাতাকে আপনার পরীক্ষার ফল জানাইয়া সুখী করিবে। বলা বাহুল্য, সে মাতাকে পরীক্ষার সুফল জানাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল।

একটু চিন্তার পর সে স্থির করিল যে অধ্যাপক মহাশয় যখন তাহাকে শনিবারে কলেজে যাইতে বলিয়াছেন, তখন আর একদিন

কলিকাতাতে অবস্থিতি করাই উচিত। ইহাতে যে কেবল মাত্র রাধাকিশোরের পরীক্ষার ফলই জানিতে পারা যাইবে এমন নহে; হয়ত একদিন কলিকাতায় থাকিলে এবং ঐ আটাত্তর নম্বরের চারি পার্শ্বে মধুলোলুপ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইলে, কোনও সুযোগে ইঞ্জিনিয়র বাবুর নিকট পরিচিতও হইতে পারে; হয়ত ঐ আটাত্তর নম্বরের গবাক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষপাত করিয়া সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলে, দৈবক্রমে, কদাচিৎ—বিচ্ছিন্ন পর্জ্জান্য পথে প্রকাশিতা মেঘান্তরবর্ত্তিনী হ্লাদিনীর ন্যায় সে সেই জ্যোৎস্নাময়ীকে একবার দেখিতে পাইবে। —যাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহাকে আর একবার দেখিলে দোষ কি? অতএব স্থির হইল যে সে আজ আর বাড়ী ফিরিবে না;—সে নবীন প্রেমিক, যে তাহার প্রেমময়ীকে একবার দেখিবার আশা ত্যাগ করিতে পারে না।

কৃষ্ণকিশোর স্থির করিল যে তাহাকে দেখিবার চেষ্টায় দিবা-ভাগটা অতিবাহিত করিবে; এবং কিরূপে সেই জ্যোৎস্নাময়ীকে আপনার পরিণীতা পত্নী করিবে, রাত্রিটা সেই চিন্তায় অতিবাহিত করিবে।—প্রেমচিন্তার পক্ষে জনকোলাহল শূন্য রাত্রিই উপযুক্ত সময়; এবং শয্যাই দেবতা মকরকেতনের আরাধনার উপযুক্ত স্থান। সে ভাবিল, আজ রাত্রে শয্যায় শুইয়া রমণীরত্ন লাভের সে উপায় চিন্তা করিবে।

শয্যার কথা স্মরণ পথে উদিত হইবা মাত্র, মৎকুণগণের অত্যাচারের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল,

তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে কোন ক্রমেই তাহারা তাহাকে প্রেমচিন্তার সুখকর অবসর প্রদান করিবে না।

কৃষ্ণকিশোর বিছানা ও বালিশের কোণ ও কুঞ্চিত অংশগুলি বার বার পরীক্ষা করিয়া, রক্তবীজ নামক অসুর সেনাপতির রক্তোৎপন্ন বংশের ন্যায়, ছারপোকার বংশ নির্বংশ করিবার প্রয়াস পাইল। কিয়ৎ কাল এইরূপ চেষ্টার পর সে ভাবিল যে ছাদের প্রখর রৌদ্রে শয্যা ও উপাধান উত্তম রূপে উত্তপ্ত করিতে পারিলে সমস্ত ছারপোকাই সহজে মরিয়া যাইবে। আমাদের মনে সন্দেহ হয় যে, ছাদে উঠিয়া নন্দনকাননতুল্য আর একটি ছাদ দেখিবার লালসা তাহার মনে পূর্ব্ব হইতেই উদিত হইয়াছিল, কেবল এযাবৎ সে একটা উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে শয্যাটি রৌদ্রতপ্ত করিবার আবশ্যক হওয়ায় সে সহজেই ছাদে উঠিবার একটা ছুতা খুঁজিয়া পাইল।

মৎকুণগন্ধামোদিত বিছানার ভার বিপুল পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় বক্ষে বহন করিয়া সে যখন সংকীর্ণ সোপানশ্রেণী অধিরোহণ করিতেছিল, তখন তাহার মনে হইতেছিল যে, পুণ্যের ভার বহিয়া স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ মণিকাঞ্চনময় স্বর্গের সিঁড়িতে ধাপে ধাপে আরোহণ করিতেছে। সে ভাবিল, ঐ প্রচণ্ড নিদাঘতপ্ত ছাদটা বুঝি নন্দনকানন অপেক্ষা স্নিগ্ধ দেখিবে; আর সেই নন্দনের রৌদ্রময় নিকুঞ্জে—তাহার হৃদয়টা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল—দেখিবে এক নয়নানন্দদায়িনী স্নিগ্ধ রূপরশ্মি জ্বালিয়া বসিয়া রহিয়াছে। হায়, প্রেমান্ধ যুবককে কে বুঝাইয়া দিবে যে গ্রীষ্ম-

কালের দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্রে কোনও নয়নানন্দদায়িনীই তপ্ত গৃহচ্ছাদকে নন্দনকানন মনে করিয়া তাহাতে বিচরণ করে না। বরং কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া অন্ধকার মধ্যে নরনয়নের অগোচরে বসিয়া এই নয়নানন্দদায়িনীগণ শীতল পাটীতে পদদ্বয় বিলম্বিত করিয়া মুদিত নয়নে লবণাক্ত কাঁচা আম আহার করে।

ছাদের দ্বার খুলিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকিশোর মনে করিল, যদি তাহার প্রেমময়ী তাহাকে শয্যার ভার বহিতে দেখিয়া, তাহাকে প্রেমিক না ভাবিয়া, রজকের ভারবাহী জন্তু বিশেষ অনুমান করে, হায়! তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে কি মহা অনিষ্টই সংসাধিত হইয়া যাইবে! অতএব সে স্থির করিল যে বিছানার মোটটি সিঁড়িতে রাখিয়া, রিক্ত হস্তে ছাদ নামক প্রণয় সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। এবং সেখান উপস্থিত হইয়া অগ্রে পরীক্ষা করিবে যে তাহারই প্রতীক্ষায় তাহার প্রেমময়ী আপনাদের ছাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কি না; তাহাকে অনুপস্থিত দেখিলে, সে পরে বিছানার মোটটা ছাদে বহিয়া যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, সে আপন কুঞ্চিত কেশদামে ও নবীন গুম্ফে হস্তচালনা করিয়া উহা সাধ্যমত পরিপাটী করিয়া লইল; কোটের যে বোতামগুলি খোলা ছিল তাহা লাগাইয়া লইল; পরিধেয় বস্ত্রের স্থানচ্যুত অংশ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া লইল। তাহার পর, ছাদের দরজা কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া দেখিল যে সত্যই তাহার প্রেমময়ী, কনকময়ী প্রতিমার ন্যায় প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী ছাদে মোক্ষদাকে দেখিয়া সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহারই সাক্ষাৎ আশায় সে সেখানে উপস্থিত হয় নাই; বুঝিতে পারে নাই যে, আত্মনাশের কামনাতেই সে সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ছাদের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, এবং নন্দনজাত পারিজাত সৌরভের পরিবর্ত্তে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ তাহার নাসরন্ধ্রে প্রবেশ করায়, এবং ভক্তের শেষ পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় একটা দেশালায়ের বাক্স তাহার পদপ্রান্তে পতিত দেখিয়া, তাহার মনোমধ্যে ঘোর সন্দেহের মেঘ উদিত হইল। সহসা তাহাতে অন্যান্য কন্যাগণের কীর্ত্তির কথা বিদ্যুদগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

কৃষ্ণকিশোর আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা দানবের বল তাহার সুগঠিত ও সুন্দর অবয়বে সঞ্চারিত হইল। সে নিমেষমধ্যে ছাদের আলিশায় আরোহণ করিয়া অন্য ছাদে লম্ফ প্রদান করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

করুণাময়ের করুণা।

প্রখর দ্বিপ্রাহরিক প্রভাকরের অত্যাচার, ঐ ত্রিতল বাটীটা ছাদরূপ পিঠ পাতিয়া, নীরবে সহ্য করিতেছিল। সেই অত্যাচারিত ছাদে দাঁড়াইয়া মোক্ষদা ভাবিতেছিল যে, সংসারটা একটা বিশাল অত্যাচারের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে; পৃথিবীটা একটা মহাপীড়নের যন্ত্রশালা মাত্র; এখানে সঙ্গীত নাই; আছে শুধু হাহাকার; এখানে সৌরভময় প্রসূন নাই, আছে শুধু অত্যাচারের দুর্গন্ধময় ক্ষত! কানন মধ্যে বলবান পশু দুর্ব্বল পশুকে দন্তাঘাতে শৃঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছে; লোকালয়ে প্রবল নরপশু দুর্ব্বল নরপশুকে ধ্বংস করিবার জন্য অদ্ভুত যন্ত্র সকল উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে; পবিত্র দাম্পত্য জীবনে প্রবল পুরুষ অবলা রমণীর প্রতি রক্তনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, অন্য দিকে, ক্ষমাময়ী ক্ষৌম্যা ক্ষমা ভুলিয়া, কুটিল কটাক্ষে অপ্রিয় প্রিয়তমকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আজ দ্বিপ্রহরের এই পাবকতপ্ত পবন, পীড়ননিপীড়িতা পৃথিবীর তপ্ত বক্ষঃশ্বাসের ন্যায়, যেন দুঃখ মোচনের প্রার্থনা লইয়া স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতেছিল। আজ আর কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পরে তাহারও প্রাণবায়ু ঐ তপ্ত বায়ুর সহিত মিলিত হইবে; তাহার পর, তাহার হৃদয় ব্যথা সমস্ত

অত্যাচারিতা অবনীর হৃদয় ব্যথার ন্যায়' স্বর্গের দিকে উঠিবে। কিন্তু যাহারা দীন প্রার্থনা লইয়া স্বর্গের দ্বারে গিয়া দাঁড়ায়, তাহারা কি স্বর্গের রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হয়? ভগবানের রাজ্যে—স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে-কোথাও কি সুবিচার আছে? দয়া আছে? অত্যাচারের প্রতিকার আছে? হায় হায়! তাঁহারই সৃজিত ধরণীতে অনন্ত কাল হইতে যে অত্যাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও যিনি চির নির্ব্বিকার ও আনন্দময় থাকিতে পারেন, তাঁহাকে মোক্ষদা কেন দয়াময় বলিবে?—কিরূপে তাঁহার নিকট সুবিচারের প্রত্যাশা করিবে? তাঁহার করুণায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেন প্রাণ ধারণ করিবে?

আজ মোক্ষদার কি দুর্দ্দৈব! আজ সে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল। আজ সে আমাদের শোভাময়ী সম্পদময়ী পৃথিবীকে অত্যাচারের যন্ত্রশালা ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিল না। আজ ঐ প্রসন্ন সুন্দর আকাশে, নরকের তীব্রজ্বালা মাত্র অনুভব করিল। আজ সে মহাপাপের পথে বিচরণ করিয়া, সর্ব্বসুখপ্রসবিনী প্রসন্না ধারত্রীকে অত্যাচারকলুষিত নিরানন্দ নরক মাত্র দেখিল।

কিন্তু মোক্ষদা ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া আপনার চারিদিকে অত্যাচারের নিরানন্দ দুর্গ গড়িয়া তুলিলেও, আনন্দময় ভগবান তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। মোক্ষদা আজ তাঁহার অসীম করুণায় আস্থা স্থাপন না করিলেও, তোমরা তাহার ভাগ্য সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছ, করুণাময়

ভগবান তাহার প্রতি কতটা করুণাময়! আমাদের তুচ্ছ জ্ঞানের স্বল্প সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া আমরা যখন ভগবানকে করুণাহীন মনে করিয়া থাকি, হয়ত ঠিক সেই সময়েই তিনি আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময়, আমাদের অতি বড় দুঃখের মধ্যেই তাঁহার মধুর করুণা, কণ্টকমধ্যে কুসুমের ন্যায়, পঙ্কমধ্যে পঙ্কজের ন্যায়, ভস্মমধ্যে বহ্নির ন্যায় লুকাইত থাকে।

মোক্ষদা আপনার প্রাণটা নিতান্ত নিরর্থক মনে করিয়া, তাহা ভস্মীভূত করিবার জন্য যখন কেরোসিন-ভিজা ওড়না খানি খুলিয়া গায়ে জড়াইতে যাইতেছিল, তখন সে হঠাৎ কৃষ্ণকিশোরের পতন শব্দে চমকাইয়া উঠিল। ভীতি ব্যাঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? কোথা থেকে এলে?

কৃষ্ণকিশোর অগ্নি উৎপাদনের উপায় নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই মোক্ষদার পদপ্রান্ত স্থিত দেশলাইটি তুলিয়া লইয়া, উহা মেসের ছাদের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া কহিল,—"আমি ঐ ছাদ থেকে এসেছি।"

মোক্ষদা কৃষ্ণকিশোরের রৌদ্ররঞ্জিত রক্তাভ মুখের দিকে চাহিয়া সেই মুখ চিনিল। ভাবিল, এই অতি সুন্দর লোকটা ছাদে আসিয়া রাত্রে চন্দ্রালোকে, দিনে রৌদ্রতাপে রোজই কি বসিয়া থাকে? ও কি আশায় বসিয়া থাকে? তাহাকে দেখিবার আশায়? উহাকে দেখিলে সে যেমন আনন্দিত হয়, ঐ লোকটা কি তাহাকে দেখিলে তেমনই আনন্দ লাভ করে? কথাটা ভাবিতে কি একটা আনন্দে মোক্ষদার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল;

সেই শিহরণে তাহার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পটা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িল। সে তাহার লজ্জিত মুখ অবনত করিয়া কহিল,—"আর—আর একদিন সেদিন খুব চাঁদ উঠেছিল—আমি প্রায় আড়াই মাস আগেকার কথা বলছি—তোমাকে ঐ ছাদে—একবারটি দেখেছিলাম। তুমি কি রোজই ও ছাদে আস?"

কৃষ্ণকিশোর অতৃপ্ত নয়নে রৌদ্রস্নাতা তরুণীকে দেখিতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল, ভগবান অংশুমালী যেন হিমাভ অংশুদলে বিচিত্র বস্ত্র বয়ন করিয়া, সুন্দরীর বরদেহ আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন।• মোক্ষদার প্রশ্ন শুনিয়া সে প্রসন্ন মুখে কহিল,—"না, আমি ত রোজ আসিনে। সেই একদিন দৈবক্রমে এসেছিলাম; আর আজ এসেছি।"

মোক্ষদা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেন এসেছ? কই, আর কাউকে ত আমরা ও ছাদে আসতে দেখিনি?"

কৃষ্ণকিশোর কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, ও মেসের কোনও ছেলে কি কখন কোনও কাযে ও ছাদে আসে না?"

মোক্ষদা কিঞ্চিৎ জোরের সহিত পুরমহিলার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কহিল,—"কখ্‌খনও নয়। ছেলেরা ও ছাদে উঠে, একথা জানলে আমরা কখনই এ ছাদে উঠতাম না। কেউ কখনও ও ছাদে আসে না। তুমি কেন এলে?"

কৃষ্ণকিশোর জানিত না যে এক অচিন্তনীয় করুণাময়ের চির করুণ হস্তের প্রেরণায় সে চালিত হইয়াছিল। সে মনে

করিল, মৎকুণগণের সংহার সাধনের জন্যই সে ছাদে আসিয়াছিল। অতএব সে কহিল,—"আমি আমার পাড়াগাঁয়ের বাড়ী থেকে এসে, এবার দু'তিন দিন ঐ মেসেই আছি। তা' ঐ মেসের যে বিছানাটায় আমি শুই, তাতে বড় ছারপোকা আছে। বিছানাটা রোদে দিয়ে ছারপোকা গুলো মারবার জন্য আমি ছাদে এসেছিলাম।"

তোমাদের শয্যায় ছারপোকাগণের প্রাদুর্ভাব হইলে, তোমাদের গৃহদেবীগণ আপনাদের চম্পককলি-বিনিন্দিত সুকোমল অঙ্গুলিগুলি, দণ্ডধরের পাশদণ্ডের ন্যায় কঠিন করিয়া তাহাদের বংশোচ্ছেদের জন্য যেমন অভিলাষিণী হইয়া থাকেন। আমরা জানিনা, সেই প্রকার কোনও অভিলাষ মোক্ষদার মনে উদিত হইয়াছিল কিনা; কিন্তু ছারপোকার প্রসঙ্গের পর সে কি ভাবিয়া কিয়ৎকাল নীরব হইয়া ছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"আমি কেন ছাদে এসেছিলাম তা' তোমাকে বলেছি। এইবার তুমি বল, এই দুপরের রোদে, এই কেরোসিনে ভেজা চাদর নিয়ে আর ঐ দেশেলাই নিয়ে তুমি কেন ছাদে এসেছিলে?"

মোক্ষদা প্রশ্ন শুনিয়া, কৃষ্ণকিশোরের রৌদ্রতপ্ত মুখের দিকে বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

কৃষ্ণকিশোর হাসিমুখে কহিল,—"কেন, তা আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি।"

মোক্ষদা কৃষ্ণকিশোরের সেই হাসিমুখ দেখিল; বুঝিল, যে

বরং ধর্ম্মরাজের পাশমধ্যে বদ্ধ হইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করা সহজ, কিন্তু সেই হাসিমুখের প্রশ্ন অবহেলা করা সহজ নহে। তথাপি সে আপন মনকে দৃঢ় করিবার জন্য মনে মনে ভাবিল,—"কে ও? একটা অপরিচিত লোক মাত্র! আমি আমাদের আপনার ছাদে কেন উঠেছি তা' জানবার ওর কি অধিকার আছে? কি অধিকারে রাজাধিরাজের মত মাথা উঁচু করে ও আমার কৈফিয়ৎ চায়? আমি কি ওর রাজ্যের প্রজা, যে ওর কথায় উত্তর দিতে বাধ্য হ'ব? বরং ও ডাকাতের মত আমাদের ছাদে লাফিয়ে পড়ে অন্যায় কায করেছে; তার জন্যে ওর ক্ষমা চাওয়া উচিত।" ইহার পর সে মনকে কতকটা দৃঢ় করিয়া প্রকাশ্যে কহিল,—"আমি কি করতে ছাদে এসেছি, তা' তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না। তুমি আবার ও ছাদে ফিরে যাও। আমাকে আমার কায করতে দাও; বাধা দিও না। যদি ইচ্ছে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, কি করি।"

কৃষ্ণকিশোর তেমনই হাসিমুখে কহিল,—"তোমার কাযটা অন্যায় কায; তা' কখনই তোমায় করতে দেব না।"

মোক্ষদা মনে করিল যে, ভয় প্রদর্শন করাইলে কিছু ফল হইতে পারে; অতএব সে বলিল,—"কিন্তু তুমি ও ছাদে ফিরে যাও। তুমি বুঝিতে পারছ না; কিন্তু তোমার কাযটাও ভাল কায হয়নি। তুমি আমাদের ছাদে এসছ বলে, আমি যদি এখনই বাড়ীর সকল লোককে ডাকি, তা, হলে তারা এসে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে।"

কৃষ্ণকিশোর আবার হাসিয়া কহিল,—"তোমার প্রাণ বাঁচাতে আমি শুধু থানায় কেন, দশ বছর জেলে যেতেও রাজি আছি! কিন্তু বাড়ীর লোককে ডাক্‌বার জন্যে তোমার পরিশ্রম করতে হবে না। আমি নিজেই তাদের ডাকব; তার পর, তাঁদের হাতে তোমাকে সমর্পণ করে ও ছাদে ফিরে যাব।"

মোক্ষদা বুঝিল কৃষ্ণকিশোরকে ভয় দেখাইবার জন্য সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহারই অধিকতর ভীতা হইবার কারণ আছে। সে আত্মহত্যা করিবার জন্য ছাদে আসিয়াছে, একথা তাহার স্নেহময় পিতা জানিতে পারিলে, সে তাঁহার কাছে এবং বাটীর অন্যান্য সকলের কাছে কিরূপে মুখ দেখাইবে? তাহার পর, তাহার আরও ভয়ের কারণ ছিল।—বালিকা হইলেও সে জানিত যে আত্মহত্যার চেষ্টা, রাজদ্বারে একটা মহা দণ্ডার্হ অপরাধ। এই দীর্ঘাকার সবল লোকটি যদি কেবলমাত্র তাহার পিতামাতাকে বলিয়া ক্ষান্ত না হয়? যদি তাহার অকৃতজ্ঞার জন্য বিরক্ত হইয়া থানায় যাইয়া সংবাদ দেয়? যদি ঐ দেশেলাই, এই ভিজা ওড়না, এই কেরোসিনের বাল্‌তি সাক্ষ্য স্বরূপ দেখাইয়া দেয়? তখন তাহার স্নেহময় পিতা, তাহার জন্য কি অপমানজনক বিপদেই না পতিত হইবেন! সে তাড়াতাড়ি বিহ্বলকণ্ঠে কহিল,—"না, না, তুমি কাউকে ডেকো না। আমার অন্যায় হ'য়েছে; আমি এমন কাষ আর কখনও করবো না।"

কৃষ্ণকিশোর পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহলে তুমি

আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছ যে এমন কায আর কখনও করবে না।"

মোক্ষদা অবনত মুখে কহিল,—"না, এমন কায আর কখনও করবো না। বল, তুমি আমায় ক্ষমা করবে; আর একথা আর কাউকে বলবে না?"

কৃষ্ণকিশোর, সেই অবনত মুখ মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া কহিল,—"না, আমি কাউকে বল্‌বো না; তোমার ভয় নেই। এখন তুমি তোমার ঐ কেরোসিন ভেজা ওড়নাখানা আমাকে দাও। আমি ওটা নিয়ে এখন ও ছাদে চলে যাব।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহের অপনয়ন

মোক্ষদা ত্রস্তে কেরোসিন-সিক্ত অঙ্গাবরণ খানি কৃষ্ণকিশোরের সম্প্রসারিত করপুটে সমর্পণ করিল ; দেবী অন্নপূর্ণা যেন ভিখারী হরের হস্তে প্রার্থিত অন্নমুষ্টি কিংবা বুঝি আপন প্রেম পুষ্পিত হৃদয়ের ভক্তি কুসুমাঞ্জলি স্থাপিত করিলেন। কৃষ্ণকিশোর সেই কেরোসিন সিক্ত পিণ্ডাকার বস্ত্র মোক্ষদার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া মনে করিল, যেন স্বর্গের কোনও দেবী একটি সুধাসিক্ত মোক্ষফল তাহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। মোক্ষদা মনে করিল, ঐ প্রাণবিনাশক বস্ত্রের সহিত সে তাহার সমস্ত প্রাণ কৃষ্ণ-কিশোরের হস্তে প্রদান করিয়াছে। তরুণী আপনাকে সংযত করিতে পারিল না, বার বার কৃষ্ণকিশোরের রৌদ্রস্নাত দীর্ঘদেহ মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিল ; তাহার মুগ্ধনয়নে সেই বরদেহ, ময়ূখমালা বিগঠিত অমর মূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সে না বুঝিয়া এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে ভালবাসিয়া ফেলিল।

তরুণীগণের এইরূপ বিবেচনাহীন ভালবাসায়, নিয়ন্ত্রিত নরসমাজ মধ্যে বিপজ্জনক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, এজন্য আমরা এইরূপ ভালবাসার নিন্দা করি। আমরা যদি তাহাদিগকে পরিণীতা না করিয়া, বয়োবৃদ্ধি সহ তাহাদের হৃদয়ে প্রেমপুষ্প

অঙ্কুরিত হইতে দিই, তাহা হইলে, তাহারা সহজে এরূপ অবৈধ ভালবাসার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ; কেন না ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা চিরকাল সর্ব্বদেশে সর্ব্ব লোক শাসিত হইয়া আসিয়াছে,—উন্মেষোন্মুখ দুইটি তরুণ হৃদয় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে, সম ও বিষম তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায়, প্রেমের বিদ্যুদালোকের তীক্ষ্ণজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

আমরা যাহাকে ভালবাসি, সহজেই তাহার বিপদাশঙ্কা করিয়া থাকি। এজন্য কৃষ্ণকিশোর যখন ওড়না খানি লইয়া, উল্লম্ফনদ্বারা মেসের বাটীর ছাদে ফিরিয়া যাইবার অভিলাষে আলিসায় উঠিবার উদ্যোগ করিল, তখন মোক্ষদার মন তাহার বিপদাশঙ্কায় সহজেই ব্যথিত হইয়া উঠিল ;—অনুরাগিণীর হৃদয় হৃদয়বাঞ্ছিতের একটা কাল্পনিক বিপদের কল্পনা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে কাতর কণ্ঠে কহিল,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, লাফিও না ; প'ড়ে যাবে।"

কৃষ্ণকিশোর ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মোক্ষদা আবার তাহাকে দেখিল। আহা! সূর্য্যরশ্মি মথিত করিয়া কে যেন তাহার সুবর্ণগঠিত অঙ্গের অঙ্গরাগ করিয়া দিয়াছে! তাহার উজ্জ্বল ললাটে স্বেদবিন্দুগুলি সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হীরক মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল ; মরি, মরি! তাহার জয়যুক্ত ললাটে কে যেন উজ্জ্বল হীরক খচিত ললাটালঙ্কার পরাইয়া দিয়াছে।

কৃষ্ণকিশোর তাহার প্রসক্তি প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে কহিল,—"পড়বো কেন? আসবার সময় ত পড়িনি?"

মোক্ষদা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন অমন ক'রে এলে?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"না এলে, তুমি কি ভয়ানক অন্যায় কায ক'রে ফেল্‌তে বল দেখি?"

মোক্ষদা তখন নিজের কথা ভাবিতেছিল না। সে কৃষ্ণকিশোরের কথায় উত্তর দিল না। সে ব্যাকুল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"যদি দৈবাৎ প'ড়ে যেতে?"

কৃষ্ণকিশোর হাসিয়া কহিল,—"এতটা উঁচু থেকে, নীচে এই পাথরের রাস্তার উপর পড়্‌লে হাত পা ভেঙে যেত, হয়ত মরে যেতাম।"

মোক্ষদা ব্যাকুলতার সহিত বিস্ময় মিশ্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দিতে?"

কৃষ্ণকিশোর পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—"দিতাম বই কি?"

মোক্ষদা প্রশ্ন করিল,—"কেন?"

এই ক্ষুদ্র প্রশ্নে মোক্ষদার পরিপূর্ণ হৃদয় যেন উছলাইয়া পড়িল। এত মধুময় 'কেন' কৃষ্ণকিশোর জীবনে আর কখন শুনে নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সূর্য্যদত্ত স্থালীতে প্রাপ্ত শাককণা ভোজন করিলে, অভুক্ত দুর্ব্বাসা ঋষির ও তাঁহার শিষ্যগণের উদর যেমন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ঐ ক্ষুদ্র 'কেন' কৃষ্ণকিশোরের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করায় তাহার হৃদয়ও তেমনই

পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—"দেখ, তোমার এই 'কেন'র উত্তর দেবার জন্যে আমার মন অস্থির হ'য়েছে। কিন্তু সে কথা, এই নির্জ্জন ছাদে দাঁড়িয়ে এখন তোমাকে বলা ভাল দেখাবে না। সে কথা আমার মার অনুমতি নিয়ে দু'চার দিনের মধ্যে তোমার বাবাকে জানাব। আমরা তোমাদেরই স্বজাতি, সেকথা তোমার বাবাকে জানাবার অধিকার আমাদের আছে।"

সে কথাটা কি তাহা যে মোক্ষদা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা তাহার আরক্ত ও অবনত মুখ দেখিলেই অনায়াসে ধরা পড়িবে। কিন্তু সে আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল না। সে কেবল মাত্র সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার মা কোথায় আছেন?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"আমাদের বাড়ীতে; তাজপুরে।"

তাজপুরে? শুনিয়া মোক্ষদা চমকাইয়া উঠিল। ভাবিল, কে এ? দুইমাস পূর্ব্বে এরই সহিত কি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল? তবে পিতা কেন আজ কহিলেন যে, ইহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে?—ইহার কথা শুনিয়া ত মনে হয় না যে, ইহার বিবাহ হইয়াছে, এই ত দুই চারি দিনের মধ্যে মাতার অনুমতি লইয়া, তাহার পিতার নিকট আসিয়া তাহার পাণিগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিবে। সহসা মোক্ষদার মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল,—আচ্ছা! এ বিবাহ করিবার জন্য পিতার অনুমতি না লইয়া মাতার অনুমতি লইবেন কেন? ইহার হয়ত কোনও

নিগূঢ় কারণ আছে! হয়ত ইহার পিতা সত্যই কোনও কন্যার সহিত ইহার বিবাহ দিয়াছেন। হয়ত সে কন্যা মনোমত না হওয়াতে, মাতার অনুমতি লইয়া, সে আবার বিবাহ করিবে। হয়ত উহার পিতা যখন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন এও গোপনে তাহাকে দেখিবার জন্যে ঐ ছাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাই এ তাহাকে স্বজাতি বলিয়া জানে। হয়ত তাহাকে দেখিয়া সেদিন উহার পছন্দ হইয়াছিল; তাই তাহাকেই বিবাহ করিতে চায়। এই নিদারুণ সন্দেহে সন্ত্রাসিত হইয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী তাজপুর? তুমি কি সেখানকার জমীদার বাবুর ছেলে?"

কৃষ্ণকিশোর কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল,—"হাঁ, আমরা তাজপুরের জমীদার। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, তুমি আমাদের কথা আগেই শুনেছিলে।"

মোক্ষদা পূর্ব্ববৎ সংশয়ান্বিতা হইয়া কহিল,—"তুমি যেমন আমাদের কথা শুনেছিলে; আমিও তেমন তোমার কথা শুনেছিলাম।"

কৃষ্ণকিশোর মনে করিল, এও বোধ হয়, বৃদ্ধা ঝিয়ের ন্যায় কোনও লোকের মুখে আমার সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে। সে সেই তথ্যটা অবগত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় কার কাছে, তুমি আমার কথা শুনেছিলে?"

মোক্ষদা কহিল,—"কেন, তুমি ত জান, তোমার বাবা আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।"

কৃষ্ণকিশোরে আরও বিস্মিত হইল; কহিল,—"আমার বাবা! আমার বাবা ত চৌদ্দবছর আগে মারা গেছেন।"

এইবার মোক্ষদার বিস্ময় সর্ব্বসীমা অতিক্রম করিল। তবে এই বাঙ্গালা দেশে আর একটা তাজপুর আছে; আর একটা তাজপুরের জমীদার আছেন? সে তাহার বিস্মিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—"কিন্তু যিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, তিনি তাজপুরের জমীদার বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার বাবাও সেই তাজপুরে গিয়ে তঁদের প্রকাণ্ড বাড়ী বাগানবাড়ী সব দেখে এসেছিলেন।"

বাগানবাটীর নাম শুনিয়া কৃষ্ণকিশোরের মনে সন্দেহ জন্মিল, যে, হয়ত রাধাকিশোরের জন্য পাত্রীর অন্বেষণে তাহার ছোটকাকা মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। সে কহিল,—"বোধ হয় আমার ছোট কাকাবাবু আমার খুড়তুতো ভাই রাধাকিশোরের বিয়ের সম্বন্ধ করবার জন্যে এসেছিলেন।"

মোক্ষদা। হাঁ, তার নাম রাধাকিশোরই বটে। তাহলে তুমি সে নও?

কৃষ্ণকিশোর। না, আমি কৃষ্ণকিশোর। তা রাধাকিশোরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লো না কেন?

কৃষ্ণকিশোর মনে মনে ভাবিল, মানুষ যখন সামান্য পার্থিব রত্ন লাভ করিবার অভিলাষ করে, তখন অযথা অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না;—একখণ্ড পদ্মরাগের জন্য মানুষ সহস্র সহস্র মুদ্রা অপব্যয় করিয়া ফেলে। হায়! হায়! সেই মানুষ,—

সেই ভগবৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব; সেই জগতের কেন্দ্রীভূতা শরীরিণী বুদ্ধি—সে যখন কোনও স্বর্গীয় রত্নলাভ করিতে যায়, তখন—কি আশ্চর্য্য!—সে অর্থব্যয় না করিয়া, বরং অর্থলাভ করিতে চেষ্টা করে! আবার সেই ঈপ্সিত অর্থের পরিমাণ কম হইলে রত্ন ত্যাগ করিয়া যায়, এই মানুষ নামক দ্বিপদ জন্তুকে কে বুদ্ধিমান বলিবে? সে মনের চিন্তা মনে রাখিয়া প্রকাশ্যে ধীরে ধীরে কহিল,—"যে কারণেই হোক, রাধাকিশোরের সঙ্গে বিয়ে না হওয়াতে হয়ত তোমার পক্ষে ভালই হ'য়েছে।"

মোক্ষদা। কিন্তু মা আজ বাবাকে বল্লেন যে বেশী টাকা খরচ করে তাজপুরের জমীদারদের বাড়ীতে আমার বিয়ে দিতে না পারলে……

কৃষ্ণকিশোর। না পারলে……কি?

মোক্ষদা। না পারলে মা আত্মহত্যা করবেন।

কৃষ্ণকিশোর। ওঃ! বুঝেছি। মা পাছে আত্মহত্যা করেন সেই ভয়ে বুঝি তুমি নিজে আত্মহত্যা করে মা বাপকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলে?

মোক্ষদা একথার উত্তর দিতে পারিল না; কেবল অবনত মুখে দাড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণকিশোর আবার বলিল,—"তোমার মাকে বোলো যে তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন; তাজপুরের জমীদার বাড়ীতেই তোমার বিয়ে হ'বে—আর তোমার বাবাকেও বোলো যে তার জন্যে তাঁর কোনও টাকা অনিচ্ছায় খরচ করতে হবে না।"

মোক্ষদার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া কোকনদশ্রী ধারণ করিল। ছি! ছি। সে কথা কি সে তাহার পিতৃমাতাকে নিজ মুখে বলিতে পারে?

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিকার সেতুবন্ধন

মোক্ষদাকে সরম সঙ্কুচিতা ও বাক্যবিরহিতা দেখিয়া কৃষ্ণ-কিশোর আর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না।

কিয়ৎকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণকিশোর আরও বুঝিল যে, এরূপভাবে এক মনোমোহিনী কিশোরীর দিকে লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে বাক্যালাপ করাও ভদ্রজনোচিত নহে। হঠাৎ বাড়ীর কোনও ব্যক্তি ছাদে আসিয়া পড়িলে, সে তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া কি মনে করিবে? হয়ত, দেবপূজার পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল এই বালিকাকে সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে। যে অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য সে এই নয়নানন্দদায়িনী নবীনার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহসী হইয়াছিল, এক্ষণে সে কার্য্য ত শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আর কেন? এখন আর এই কিশোরীর মুখপদ্ম নিঃসৃত মধুময় কথা শ্রবণ করিবার জন্য দীর্ঘ বাক্য বিনিময়ে সময় অতিবাহিত করা উচিত নহে।

অতএব সত্বর মেসের ছাদে প্রত্যাগমনের ইচ্ছায় সে কহিল,—"লাফিয়ে ও ছাদে যেতে তুমি আমাকে বারণ করেছিলে। এখন তোমার বারণটা অবহেলা করবো না। কিন্তু অন্য কি উপায়ে ও ছাদে যাব বল দেখি?"

লজ্জার অরুণরাগে আবার মোক্ষদার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু এবার তাহার প্রবাল-অধর-প্রান্তে ক্ষীণ অথচ মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্মিত মুখে কহিল,—ঐ যে বাঁশ গুলো দেখছ, ওর কতকগুলো যদি এ ছাদের কার্ণিশ থেকে ও ছাদের কার্ণিশ পর্য্যন্ত সাজিয়ে দেওয়া হয়, আর তার দুদিকে দুখানা বাঁশ আমাদের আলসে থেকে ও ছাদের আলসে পর্য্যন্ত রাখা হয়, তা হলে তুমি অনায়াসে ঐ বাঁশ দু'খানা ধরে কার্ণিশের বাঁশ গুলো দিয়ে ও ছাদে যেতে পারবে। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, তা হলে আমি সহজেই ঐ রকম একটা পুল করে দিতে পারি।"

আমরা এই আখ্যায়িকার কোন স্থানে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, এ ছাদের এক পার্শ্বে কতকগুলি বংশখণ্ড পতিত ছিল। মোক্ষদা সেইগুলি কৃষ্ণকিশোরকে দেখাইয়া দিল। কৃষ্ণকিশোর একে একে সেগুলি বহন করিয়া আনিল। মোক্ষদা একে একে তাহা গ্রহণ করিল এবং আলিশাতে আপন কোমল বক্ষ স্থাপিত করিয়া, অবনত হইয়া আলিশা হইতে সে গুলিকে কার্ণিসে নামাইয়া দিল। কেবল মাত্র দুইখানি বংশ নামাইল না; তাহা আলিশাতেই রহিল। এইরূপে নায়িকা নায়কের নিরাপদ প্রয়াণের জন্ম ভীষণ রৌদ্রতাপ সহ্য করিয়া, আপন বরদেহকে ঘর্ম্মজলে ক্লিন্ন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব সেতু বিরচিত করিল।—তোমরা কখন তেমন সেতু দেখিয়াছ কি?

সেই সেতু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকিশোর মেসের ছাদে

প্রত্যাবৃত্ত হইল। বলা বাহুল্য, আসিবার সময় সে কেরোসিন-ভিজা ওড়না খানি লইয়া আসিতে ভুলে নাই।

সে চলিয়া আসিবার পর মোক্ষদা আবার বংশখণ্ডগুলি টানিয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া নায়কের প্রস্থান-পথচিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিল।

যতক্ষণ মোক্ষদা উপরিউক্ত কার্য্যের জন্য ছাদে ছিল, ততক্ষণ কৃষ্ণকিশোর মেসের ছাদে দাঁড়াইয়া তাহার কর্ম্মরত অবয়বগুলি মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে ছাদ হইতে প্রস্থিতা হইলে, কৃষ্ণকিশোর মেসের ছাদের দরজাটি অর্গলবদ্ধ করিয়া, বিছানাটি রৌদ্রতপ্ত করিবার কথা ভাবিল। কিন্তু তখন আর তাহার কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা ছিল না। আর একদিন কলিকাতায় থাকিয়া রাধাকিশোরের পরীক্ষার ফল জানিতে হইলে অকারণ অনেকটা সময় নষ্ট করা হইবে। যাহার সংবাদ, সেই যখন এই কলিকাতাতেই শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যোগী নহে, তখন সে কেন অপরের অপ্রিয় সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য, আর একদিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া শুভকর্ম্মের বিলম্ব ঘটাইবে? আর সেই দিনই দেশে ফিরিয়া মোক্ষদাকে বিবাহ করিবার জন্য মাতার অনুমতি লইয়া, সে ত পরদিনই আবার কলিকাতায় আসিতে পারিবে। তাহাতে যথাসময়ে রাধাকিশোরের পরীক্ষার ফলও জানা হইবে, এবং আরও একদিন পূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিতে পারিবে।—অতিসত্বর—অর্থাৎ অন্যত্র কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনের

পূর্ব্বেই তাহার হৃদয়াকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবটা তাঁহাকে জানাইলে তাহার হৃদয়ের গুরুভার লঘু হইয়া যাইবে। একবার সে যে কোন উপায়ে হউক বিবাহের প্রস্তাবটা তাঁহার নিকট তুলিতে পারিলেই তাঁহাকে সম্মত করা কঠিন হইবে না।

সে শয্যাটি আর রৌদ্রতপ্ত না করিয়া, তাহা স্কন্ধে বহিয়া বন্ধুর কক্ষে প্রত্যাগত হইল। এবং সেই দিনই বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

তখন কলিকাতায় তাহার একটি মাত্র কার্য্য অবশিষ্ট ছিল। সেই ওড়না খানি! তাহার প্রাণাধিকার প্রাণান্তকারিণী সেই ওড়ানা খানি! তাহা ত সে সেই মেসের বাসায় কুলোকের কলুষিত দৃষ্টির তলায় রাখিয়া যাইতে পারে না। তাহা তাজপুরে লইয়া যাইতেই হইবে; একদিন সেই পরমারাধ্যা ওড়না খানা সে গায়ে দিয়া দেখিবে, তাহার প্রবল প্রেমতপ্ত অঙ্গটা শীতল হয় কিনা, সেই শ্বেত ওড়নার স্পর্শটা বসন্তের কমল পলাশের স্পর্শ অপেক্ষা স্নিগ্ধ কিনা। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া তাহা দেশে লইয়া যাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার কেরোসিন গন্ধ অপনয়ন করা আবশ্যক।

এই কার্য্যের জন্য সে বৃদ্ধা ঝিকে স্মরণ করিল। দৈবক্রমে সেদিন ঝি তখনও বাটী যায় নাই। সে ঝিকে ডাকিয়া একটা মিথ্যা কথা রচনা করিল। প্রেমলীলায় মিথ্যা নীতিবিরুদ্ধ নহে। কহিল,—"দেখ, ঝি, আমি রাত্রে এই চাদর খানা গায়ে দিয়ে শুই। কালরাত্রে হঠাৎ ল্যাম্পটা উল্‌টে যাওয়ায় মেঝেতে কে-

রোসিন পড়েছিল ; তা আমি এই চাদর খানা দিয়ে মুচেছি। তুমি দু' আনার সাবান কিনে এনে এখানা যদি কেচে দাও বড় ভাল হয়।

তখন বেলা প্রায় একটা। তখন ভাত লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঝি পূর্ব্বদিবস কৃষ্ণকিশোরের নিকট হইতে যে পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, তখনও তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা ভুলিতে পারে নাই। সে সহজেই সম্মতা হইল। সে তৎক্ষণাৎ ছয় পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া, দুই পয়সার সাবান আনিয়া ওড়না খানা ধৌত করিয়া তীব্র রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিল।

সময়াতিপাত করিবার জন্য কৃষ্ণকিশোর একবার কলেজে গেল। সেখানে যাইয়া শুনিল যে, সেই দিনই সে আসিবার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্ব্বে পরীক্ষার ফলের তালিকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিজের নামটা প্রথমেই দেখিয়া লইল। তাহার পর জানিল যে, রাধাকিশোর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে ভাবিল, যে দুরদৃষ্ট যুবক ইঞ্জিনিয়র বাবুর কন্যার ন্যায় রমণীরত্ন লাভ করিতে পারে নাই, তাহার ভাগ্যে অকৃতকার্য্যতা ব্যতীত বিধাতা কি আর কিছু লিখিবেন! এই নারীরত্নকে সে হারাইয়াছে, সে জন্মের মত ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছে ; দেবতাগণ তাহার প্রতি চিরদিনের জন্য বিমুখ হইয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিমতী ও ভক্তিমতী।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গোমস্তা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া সকল সংবাদ কর্ত্রীঠাকুরাণীকে প্রদান করিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী সন্তুষ্ট হইলেন; এবং গোমস্তাকে উপদেশ প্রদান করিলেন—"আপাতত: তুমি এই বিয়ের কথাটা গোপন রাখবে; কৃষ্ণকিশোর বাড়ী ফিরে এলে তাকেও বলবে না। কিন্তু এখন থেকেই বিশেষ উদ্যোগ করে একটা কায করতে হবে। তুমি জান যে আজ বাড়ী কেনার জন্য টাকাটা দেওয়ার পর, আমাদের হাতে প্রায় কিছুই থাকবে না। তুমি বকেয়া খাজানা একটু জোর ক'রে আদায় করে হাতে কিছু মজুত করবার চেষ্টা কর।—আমি বিয়েতে চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে চাই।"

গোমস্তা। চার পাঁচ হাজার টাকার জন্যে আপনার কোন চিন্তা নেই। আষাঢ় কিস্তির মালগুজারি বাদে, আমি আমার আদায়ী তহবিল থেকে আষাঢ় মাসের প্রথমে অনায়াসে তিন হাজার টাকা দিতে পারবো। আরও তিন হাজার টাকা আমি প্রজাদের কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বলে আদায় করে নেব।

কর্ত্রী। কিন্তু আমি যে তোমায় এই মাত্র বললাম যে বিয়ের কথাটা গোপন রাখবে।

গোমস্তা। ওঃ! তাই ত। তাহলে কি করে করে আদায় করা যাবে?

কর্ত্রী। বিয়ের যৌতুক বলে মোটেই কিছু আদায় করবে না। তুমি এতদিন আমাদের কাছ থেকে জাননা যে আমি খাজনা ছাড়া আর কিছুই আদায় কর্ত্তে চাইনে?

গোমস্তা কর্ত্রীঠাকুরাণীর তিরস্কার গায়ে না মাখিয়া কহিল,—"কিন্তু রাধাকিশোর বাবুর বিয়েতে ছোটবাবু মহাশয় ত প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিলেন। এতে ত আমি কিছু দোষ দেখতে পাই না।

কর্ত্রীঠাকুরাণী একটু হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু বিয়ের কথাটা গোপন রেখে, তুমি বিয়ের জন্যে টাকাটা কি রকম করে আদায় করবে, শুনি?"

গোমস্তা 'বকেয়া' লোক; সে আদায় কার্য্যে ঘুণ বিশেষ। তাহার উপর, কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের পণ না লইবার প্রস্তাবে সে বড়ই ক্ষুন্ন হইয়াছিল। সে ভাবিল যে, কর্ত্রী যদি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রজাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে না দেন, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে অন্য উপায়েও অর্থ আদায় করা যাইতে পারিবে। সে একটু বিবেচনা করিয়া কহিল,—"তা বিবাহের যৌতুক বলে নাই বা আদায় করলাম। ঢেড্‌রা ফিরিয়ে প্রজাদের মধ্যে প্রচার করে দিলেই হ'বে, যে আমাদের বাবু সাবালক হ'য়েছেন; আগামী পয়লা আষাঢ় তিনি সদরে উপস্থিত থাক্‌বেন; সকলে যেন যথাযোগ্য

নজরানা দিয়ে ঐ দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ব্যস, ব্যস, এক বারে চার পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়ে যাবে।

গোমস্তার উদ্ভাবনা শক্তি দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী আবার হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "না, এ রকম নজরানা নিতেও কৃষ্ণকিশোর কোনও মতে রাজি হ'বে না। তুমি বকেয়া খাজনা ছাড়া প্রজাদের কাছ থেকে কিছুই আদায় করো না। খাজনা আদায় করে, তুমি যদি আমায় তিন হাজার টাকা দিতে পার, তা হ'লেই আমার চলে যাবে। কেন না, বাড়ীর জন্যে তিশ হাজার টাকা দেওয়ার পরও আমার হাতে দু' এক হাজার টাকা থেকে যাবে; তা' ছাড়া গোশালার তহবিল থেকেও কিছু পাওয়া যাবে।"

গোমস্তা কর্ত্রীঠাকুরাণীর আজ্ঞার বিরুদ্ধে আর বাক্যোত্থাপন করিতে সাহস করিল না। সে তাঁহাকে নিতান্ত অবুঝ বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল; এবং ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট বিবাহের কথা প্রকাশ করিল না।

সন্ধ্যার পরে গৃহিণী দেববন্দনা করিয়া, রন্ধনকার্য্যে রত ছিলেন। তখন ছোট বধূ ঠাকুরাণী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গৃহিণী চুল্লী হইতে পাকপাত্র নামাইয়া তাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন।

ছোট বধূ কহিলেন, "রেজিষ্টারী করা দলিলখানা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দিদি; আর টাকাটা আমাকেই নিয়ে যেতে ব'লেছেন।"

গৃহিণী বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিলেন; এবং তাহা গণিয়া ছোট বধূ ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি মনে করেছিলাম, টাকাটা নেবার জন্যে ঠাকুরপো নিজে আসবেন। একবার আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে ভাল হ'ত;—আমি তাঁকে খরচপত্র সম্বন্ধে বুঝিয়ে কিছু বলতাম। এখনও তিনি যদি একটু বুঝে চলেন, শেষ বয়সে আর কষ্ট পেতে হ'বে না। তিনি অবুঝ ন'ন। তুই তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলিস্ ছোট বৌ।"

ছোটবধূ কহিলেন, "তিনি যে বুঝেন না, এমন নয়; কিন্তু বুঝে সুঝে পাঁচজনের কথায় এমন কায করে বসেন, যার জন্যে পরে আর একটুও শান্তি পান না। তিনি স্বামী, তিনি গুরু, তাঁকে আর আমি কি বোঝাব, দিদি? তবে তাঁর অশান্তি দেখলে মনটায় বড় কষ্ট হয়; তাই এক একবার বলি। কিন্তু বোকা মানুষ, তাঁর মত বুদ্ধিমানকে কি আমি বোঝাতে পারি? আমরা মেয়ে মানুষ, দিদি, আমরা বোঝাবার জন্যে জন্মাইনি, আমরা স্বামীর সেবার জন্য জন্মেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, দিদি ওঁর সেবা কর্ত্তে কর্ত্তে আমি যেন শেষের কটা দিন কাটিয়ে যেতে পারি।"

এই সেবাময়ী ভক্তিমতী সধবার নিকট কর্ত্তব্যময়ী বুদ্ধিমতী বিধবার সমস্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান সমস্ত বুদ্ধিগৌরব ম্লান ও অবনত হইয়া পড়িল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে হেঁট মুখে বসিয়া ভাবিলেন,—"ধন্য ছোট বউ, তুইই ধন্য! তুই স্বামীর ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করে' ঐশ্বর্য্যময়ী হতে চাসনে; তুই কেবল ভক্তি

দিয়ে প্রাণ দিয়ে স্বামী সেবা করতে চাস! আমি আজ মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্ছি, তুই যেন, তোর স্বামিসেবাব্রত উদ্যাপন করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিস্, আর আমরা যেন ভগবানের কৃপায় জন্মজন্মান্তর তোরই মত অনন্যকর্ম্মা হয়ে স্বামীর সেবা করতে পারি।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গেজেট।

গোমস্তার সহিত যখন ইঞ্জিনিয়ার বাবু বহির্বাটীতে বসিয়া কন্যার বিবাহের কথা কহিয়াছিলেন, তখন বাটীর কোনও লোক বহির্বাটীতে আসে নাই। যে ভৃত্য গোমস্তাকে জলখাবার দিবার জন্য আহূত হইয়াছিল, সেও গোমস্তার কোনও কথা শ্রবণ করে নাই। সুতরাং বাটীর কোন লোকই মোক্ষদার বিবাহের নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি কথাও অবগত হইতে পারে নাই। ইঞ্জিনিয়ার বাবুও এ সম্বন্ধে কোনও কথা বাটীর কোনও লোকের নিকট প্রকাশ করেন নাই। সেদিন গৃহিণী স্বামীকে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তাহার পর আর কি কথা বলিলেন, তাহা কয়েকদিন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই; একজন্য তিনি কয়েক দিন মৌনব্রতাবলম্বিনী হইয়া বাটীতে বাস করিতেছিলেন; একজন্য ইঞ্জিনিয়র বাবু বিবাহের নূতন প্রস্তাবটা অপ্রকাশিত রাখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। একদিন মোক্ষদার জন্য কয়েকটি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবার পূর্ব্বে তিনি মৌনব্রতচারিণী গৃহিণীর সদুপদেশ প্রার্থনায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী বক্রনেত্রে তাঁহার

দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বিরাগভরে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন; সে দিনও বিবাহের নূতন সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

আমরা জানি, মোক্ষদা যদি পাত্রের বিশেষ পরিচয় অনবগত থাকিয়া, একটা নূতন বিবাহের সম্বন্ধের কথা বাটীর লোকের মুখে শুনিতে পাইত, তাহা হইলে সে কখনও সুখী হইতে পারিত না। অতএব বিবাহের নূতন প্রস্তাবের কথা শুনিতে না পাবায় সে অসুখী হয় নাই। বরং সে যখন দেখিল যে, পিতা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নূতন পাত্রের অনুসন্ধানে বিদেশ যাত্রা করিলেন না, তখন সে আনন্দেই দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার মত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তরুণী হৃদয়ে নবীন যৌবনোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াও, বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে কেন পরাঙ্মুখ হইল, তাহা আমরা জানি।

এই সময়ে কন্যার ও পত্নীর অগোচরে, এবং বাড়ীর অন্যলোকের অজ্ঞাতে ইঞ্জিনিয়র বাবু ধীরে ধীরে বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কোনও দিন পোদ্দারের দোকানে যাইয়া কন্যার জন্য অলঙ্কার গড়াইতে দিলেন; কোনও দিন জামাতার জন্য অঙ্গুরীয়ক, ঘড়ী, চেন ক্রয় করিয়া আনিলেন; কোনও দিন বস্ত্রালঙ্কার ক্রয় করিয়া, আপন শয়ন কক্ষের আলমারীর মধ্যে সঞ্চয় করিলেন; কোনও দিন জামাতাকে দান করিবার জন্য রজত নির্ম্মিত তৈজস আনিয়া পেটকমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; কোনও দিন নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া টেবিলের ড্রয়ার মধ্যে

গুছাইয়া রাখিলেন। এইরূপে কন্যার বিবাহোৎসবের উদ্যোগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সময় একদিন রাস্তায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভদ্রলোকের বাহুতলে কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ দেখিয়া, কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাগজগুলি কি?"

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—"কলিকাতা গেজেট। আজ এতে বি, এ, পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, আমার ভাইপোটি বি, এ, দিয়েছিল, তাই তার খবরটা জানবার জন্যে এক কপি কিনেছিলাম। আট আনা পয়সা বৃথা গেল। বাবাজীবন ফেল হয়েছেন। এতে তার নাম পাওয়া গেল না। সকল ক্লাবের আর পার্টির খাতায় যার নাম থাকে, মশাই, গেজেটে তার নাম থাকে না।—এটা আমি বরাবর দেখে আসছি।"

ইঞ্জিনিয়ার বাবু ভদ্র ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তা, একবারেই সকল ছেলে পেরে উঠে না। আর একবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পাশ হ'বে।"

ভদ্র। চেষ্টা করলে ত? সিগারেট খাওয়া, আর হোটেলে পিক্‌নিক (picnic) পার্টিতে যোগ দেওয়ার নাম চেষ্টা নয়। কোথায় এক জমীদারের ছেলে তার বন্ধু জুটেছে, মশাই তার বন্ধুত্বের খাতিরে ছোঁড়াটা ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট করলে।

ইঞ্জিনিয়ার বাবু ঈষৎ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাকার জমীদার পুত্র আপনি জানেন কি?"

ভদ্র। এই যশোর জেলার একটা পাড়া গাঁ; নামটা, কি জান, আমার মনে পড়ছে না।

ইঞ্জিনিয়র। ছেলেটির নাম কি?

ভদ্র। নামটাও আমার মনে আসছে না। কিন্তু ছেলেটাকে আমি চিনি।—মাথায় চেরা সিঁথি, চোখ দু'টি ঢুলু ঢুলু ঠোঁটে সিগারেট—একবার যদি ছেলেটাকে দেখেন, মশাই, তাহ'লে আপনার ইচ্ছা যাবে যে এরোপ্লেনে চড়ে, একবারে আট হাজার ফুট উপর থেকে একটন ওজনের একটি বোমা তার চেরা সিঁথির উপর……বুঝেছেন?

ইঞ্জিনিয়ার বাবু হাসিলেন।

ভদ্র। হাসবেন না, মশাই! ঐ ছেলেটার মাথায় একটা বোমা ফেলবার জন্ম আমি এই বুড়ো বয়সে এরোপ্লেনে উঠে প্রাণ হারাতেও রাজি আছি। ও সব ছেলে বেঁচে থাকলে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক ছেলেকে বিগড়ে দেবে—পৈতৃক পয়সা খরচ করে বিগড়ে দেবে।

ইঞ্জিনিয়র। যাক, ও সব কথা ভেবে আর মন খারাপ করবেন না। যতদিন পৃথিবী পৃথিবীই থাকবে, ততদিন ও রকম দু' একটা ছেলে জন্মাবেই।

ভদ্র। বৃথায় আট আট আনা পয়সা খরচ করে গেজেট খানা কিনে আমার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে;—রাগ আর বরদস্ত করতে পাচ্ছি নে।

ইঞ্জিনিয়র। রাগের জিনিষটা বরং আমায় দিন; আমি আপনাকে আট আনা পয়সা দিচ্ছি।

এইরূপে গেজেট সংগ্রহ করিয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু বাটী ফিরিলেন। এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নবমনোনীত জামাতা শ্রীমান কৃষ্ণকিশোর সিং ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এই পরমানন্দ আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে উপভোগ করাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গৃহিণীর অদৃষ্টের আনন্দোপভোগ অর্গলবদ্ধ দ্বারের বাহিরে পড়িয়া রহিল। হায়! কে বলিবে, প্রতিদিন কত স্বর্গীয় আনন্দ, কত পরিতোষ আমাদের দ্বারের নিকট আসিয়া তাহা অর্গল বদ্ধ দেখিয়াছে!—দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে!

ইঞ্জিনিয়র বাবু ব্যথিত হৃদয়ে বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন; এবং অন্যমনস্ক হইয়া গেজেট খানা লইয়া রাধাকিশোরের নাম খুঁজিতে লাগিলেন। রাধাকিশোর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; সুতরাং ইঞ্জিনিয়র বাবু গেজেটে তাহার নাম দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি একটা নিষ্কৃতির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সেই দিনই দিবাবসান কালে তিনি গাড়ী চড়িয়া পোদ্দারের দোকানে যাইতেছিলেন। একস্থানে ট্রাম গাড়ী রেলচ্যুত হওয়ায় কিয়ৎকালের জন্য চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়র বাবুর গাড়ী অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গাড়ীতে বসিয়া

ইঞ্জিনিয়র বাবু রাস্তার দুই পার্শ্বের পণ্যবীথিকা অবলোকন করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ঐ দোকানের প্রবেশ দ্বারের উপর বড় বড় ইংরাজি অক্ষরে লিখিত আছে, The Stüdents Swadeshi Hotel। ঐ স্বদেশী ভোজনাগারের বিদেশী নামের নিম্নে বাঙ্গালায় লিখিত আছে,—"এখানে, চপ্, কাটলেট্, ফ্রাই, কারি প্রভৃতি সমুদায় ইংরাজি খাদ্য সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। আসুন, আসুন, আসুন।" এই ভোজনাগারের তিনটি দ্বারের সম্মুখে একটু বারান্দা ও দুই সারি সিঁড়ি ছিল। ইঞ্জিনিয়র বাবু দেখিলেন যে, সেখানে কয়েকটি আদ্দির পাঞ্জাবী পরা সিগারেট-মুখ যুবকের সহিত রাধাকিশোর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিধানে জরিপাড় ধুতি, গায়ে রেশমী পাঞ্জাবী, স্কন্ধে অসংযত উড্ডীয়মান উড়ানি, হাতে রিষ্ট ওয়াচ ও মুখে সিগারেট। একজন যুবক তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল,—"Three cheers for our host Mr. R. K. Chatterjee।" রাধা-কিশোর প্রত্যুত্তরে কহিল,—Three cheers for our gallant B. A. fails! ইঞ্জিনিয়র বাবু মনে মনে আবার বলিলেন,—"জয় ভগবান, তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন।

কলেজে রাধাকিশোর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণকিশোর বেলা চারিটার পর মেসের বাসায় ফিরিয়া আসিল; জলযোগ করিল; ওড়নাখানি শুকাইয়াছিল, তাহা লইয়া, সযত্নে পাট করিয়া, আপনার ব্যাগের মধ্যে পূরিল; এবং ছয়টার গাড়ী ধরিবার জন্য অনেক পূর্ব্বেই শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইল।

ষ্টেশনে আসিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী কিন্তু সহজে অগ্রসর হইতে চাহিল না; সময় এবং গাড়ী দুইটাই যেন অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণকিশোর মনে করিল, ষ্টেশনের ঘড়ী গুলা যেন ছয়টা বাজিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

অবশেষে যেন এক যুগ পরে, অতি কষ্টে ছয়টা বাজিল; কৃষ্ণকিশোর উৎকর্ণে গাড়ীর বংশীরব শ্রবণ করিল। গাড়ী ছাড়িল; কি একটা নূতন আনন্দে কৃষ্ণকিশোরের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সে গাড়ীর একটি কোণের আশ্রয়ে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আপনার শুভ সংকল্প সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে স্থির করিয়া রাখিল যে বাটী পৌঁছিয়া প্রথমেই মাতার নিকট

বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ; এবং ইঞ্জিনিয়র বাবুর নিকট আসিবার জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিবে। মাতা তখনই নিশ্চয়ই সেই অনুমতি প্রদান করিবেন। তাহার পর, আগামী কল্যই সে আহারাদির পর কলিকাতায় আসিয়া অপরাহ্নে ইঞ্জিনিয়র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইঞ্জিনিয়র বাবু সহজেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন ; কারণ পত্নীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে, তাজপুরের জমীদার পুত্রের সহিতই কন্যার বিবাহ দেওয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই ; আর রাধাকিশোরের বিবাহ হইয়া যাওয়ায় সে ছাড়া বিবাহযোগ্য তাজপুর কুলোদ্ভব আর কেহ নাই ; তাহার উপর রাধাকিশোরের সহিত তুলনায় সে তাঁহার কন্যার পক্ষে কোনও অংশে হীন পাত্র হইবে না। তোমরা যুবকগণ ! তোমরা আপন আপন বিবাহের সময় আপনাদিগকে মনোনীতা বধূগণের কতটা উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণকিশোরের শেষ আত্মগৌরবটি ক্ষমা করিও।

কৃষ্ণকিশোর ঠিক করিয়া লইল যে উপরিউক্ত কারণে ইঞ্জিনিয়র বাবু নিশ্চয়ই তাহরই সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইবেন। তখন সে বিধাতার কৃপায়, তাহাকে বিবাহ করিয়া বাটী লইয়া আসিবে ; তখন ভাস্কর করের ন্যায় তাহার ভাস্বর রূপ-রশ্মি তাহার জীবন পথে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত করিয়া তুলিবে, তাহার কমনীয় রূপাগ্নি, পুরাকালের ঋষিদিগের হোমাগ্নির ন্যায় তাহাদিগের গৃহকে তপোবনের ন্যায় পবিত্র করিয়া রাখিবে,

সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী, ভগবানের মূর্ত্তিমতী করুণার মত, তাহাদের সংসারে বিচরণ করিবে। আর কৃষ্ণকিশোর ধন্য হইবে;—তাহার আশার সরোবরে ফুল্ল শতদল ফুটিয়া উঠিবে; তাহার হৃদয় নন্দনে স্বর্গের আনন্দ প্রবাহিত হইবে, তাহার হৃদয় রাজীবে সেই দেবীপ্রতিমা ইষ্টদেবীর ন্যায় বিরাজ করিবে;—আর সে ধন্য হইবে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যার শিশির পাতে প্রসূন কলিকা যেমন ধন্য হয়, শারদাকাশ যেমন পূর্ণিমার নিশানাথকে বক্ষে ধরিয়া ধন্য হয়, নিদাঘ তপ্ত ক্ষেত্র সকল প্রথম বর্ষার বারিবর্ষণে যেমন ধন্য হয়, ভারত সম্রাটগণ মণিময় মুকুটে কোহিনুর ধারণ করিয়া যেমন ধন্য হইয়া থাকেন, কৃষ্ণকিশোর সেই প্রেমময়ীকে পত্নীরূপে পাইয়া তেমনই ধন্য হইবে, তেমনই জয়যুক্ত হইবে।

সেই গাড়ী যে বাষ্পীয়বেগে ছুটিতেছিল, তাহা অপেক্ষা দ্রুততর বেগে কৃষ্ণকিশোর নবীন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। আমরা বৃদ্ধ, আমরা তাহার অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িব। এ জন্য আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম।

গাড়ী যথাকালে কৃষ্ণকিশোরকে লইয়া তাজপুরে পৌঁছিল।

রাত্রি নয়টার পর সে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া ডাকিল—'মা!'

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাতাপুত্রের কথোপকথন।

মাতা তখন যেন পুত্রের প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিয়াই রন্ধন শালায় বসিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি মাতৃগণের হৃদয় বলিয়া দেয়, কখন তাঁহাদিগের অঞ্চলনিধিগণ অঞ্চলাশ্রয়ে ফিরিয়া আসিবে। কৃষ্ণকিশোরের মাতাও বোধ হয় সেইরূপ কোনও উপায়ে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আজ কৃষ্ণকিশোর বাটী ফিরিয়া আসিবে। তাই যখন কৃষ্ণকিশোর বাটী আসিয়া তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিল, তখন তিনি সম্পূর্ণ অনুৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন,—"তুই ওপরে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়। আমি ততক্ষণ তোর জন্য খান কতক লুচি ভেজে নি, তার পর তোর খাবার আমি ওপরেই নিয়ে যাব এখন।"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"না, মা, আমি তোমাকে প্রণাম না ক'রে ওপরে যাব না। তুমি শীগ্গির রান্নাঘর থেকে বাইরে এসো। তা' না হলে আমি জুতো পায়ে দিয়েই তোমার রান্নাঘরে ঢুকে পড়বো।"

মাতা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"না, না, জুতো পায়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকিস্‌নে। আমি বাইরে যাচ্ছি।"

মাতা বাহিরে আসিলে, পুত্র তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণত হইল; এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদপূর্ণ করতল, দেবতার মণিমাণ্ডিত মুকুটের স্থায়, আপনার অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া কহিল,—"মা, আমি পাশ হ'য়েছি।"

মাতা পুত্রের দীপালোকিত মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টিতে আপ্লুত করিয়া কহিলেন,—"কিন্তু তোর মুখ অমন শুকিয়ে গেছে কেন? সারাদিন যেন রোদে রোদে ঘুরে বেড়িয়েছিস।"

বাস্তবিক প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া ছাদের উৎকট রৌদ্রতাপে তাহার মুখ তপ্ত অগ্নতাপে বিবর্ণ তরুণ কদলীপত্রের স্থায় ম্লান হইয়া গিয়াছিল। অন্তরমধ্যে তাহার সে জ্ঞান থাকিলেও, সে মাতার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। সে কেবলমাত্র কহিল,—"না, মা, আমি ত রোদে রোদে ঘুরে বেড়াইনি।"

মাতা হাসিয়া কহিলেন, "তবে বুঝি দু'পরের রোদে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলি? তা না হ'লে তোর মুখের রং অমন ঝল্‌সে যাবে কেন?"

মাতার অনুমানটা ঠিক লক্ষ্যভেদ করিয়াছিল। শুনিয়া নন্দকিশোর চমকাইয়া উঠিল; এবং বিস্মিত নেত্রে মাতার মুখের দিকে চাহিল।

মাতা আবার হাসিয়া কহিলেন,—"যা, যা, আর দেরী করিসনে। ওপরে গিয়ে ঠাণ্ডাজলে আগে মুখ হাত বেশ ক'রে ধুয়ে ফেল; তার পর গাড়ীর ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো

মাথা কাপড় খাবা কেন কেলিস্‌। তোর কাপড়ছাড়া হ'তে না হ'তে আমি খাবার নিয়ে যাব এখন।"

কৃষ্ণকিশোর কহিল—"না, মা, তুমি উপরে খাবার নিয়ে যেয়ো না। আমি কাপড় ছেড়ে, নীচে এসে, তোমার সঙ্গে খাব। খেতে খেতে তোমাকে কত নূতন কথা বলবো।"

সে মনে করিয়াছিল, এই নূতন কথার মধ্যে মাতার নিকট বিবাহের প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবে। হায়! হায়! অদূরদর্শী যুবক! সে ত জানিত না মাতার নিকট আপন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা একটি সুশিক্ষিত ও সুশীল পুত্রের পক্ষে কত শক্ত কায।

পুত্রের মুখে নূতন কথার উল্লেখ শুনিয়া মাতা মনে মনে হাসিলেন, তাঁহারও নিকটে অনেক নূতন কথা—পুত্রের ধারণার অতীত, অনেক বিস্ময়োৎপাদক নূতন কথা—তাহার জন্য সঞ্চিত ছিল। মাতা কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে শুনাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন,—"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যা; শীগ্‌গির মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে খেতে আয়।"

কৃষ্ণকিশোর দ্রুতপদক্ষেপে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

মাতা ভাণ্ডারঘর হইতে ময়দা বাহির করিয়া একজন পরিচারিকাকে মাখিতে দিলেন। এবং অন্য পরিচারিকাকে দুইটা কইমাছ বাছিয়া আনিতে বলিলেন;—কৃষ্ণকিশোরের জন্য বাটীতে সর্ব্বদা জীবন্ত মৎস্য ও হংস-ডিম্ব সংগৃহীত থাকিত

দাসীদিগকে কার্য্যভার দিয়া, তিনি নিজে রন্ধনশালার এক প্রান্তে আসন বিস্তৃত করিয়া, শীতল জলের পানপাত্র রাখিয়া এবং লবণ-লঙ্কা-লেবু ইত্যাদি দিয়া, পুত্রের আহারস্থান রচনা করিলেন। পরে মৎস্য পাক করিয়া এবং অন্যান্য নিরামিষ ব্যঞ্জন থালাতে সাজাইয়া লুচি ভাজিতে বসিলেন।

প্রায় পনের মিনিট পরে কৃষ্ণকিশোর নিম্নতলে আসিয়া দেখিল যে, পরিচারক আপন অন্নপাত্র লইয়া বহির্বাটীতে যাইতেছে এবং পরিচারিকাগণ রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় আহার করিতে বসিয়াছে। এবং মাতা পাকপাত্র সকল গুছাইয়া রাখিয়া, রন্ধন-স্থান পরিষ্কৃত করিয়া, আহার স্থানে থালাতে তাহার খাদ্য রাখিয়া, পাখা লইয়া পাশে দাঁড়াইতেছেন। সে আহার করিতে বসিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি এত কায এত শীগ্গির ক'রো কেমন করে?"

মাতা মনে মনে ভাবিলেন, বেশী কায দূরের কথা, যার ভাগ্যে ভগবান্ স্বামী সেবা লেখেন নাই, তাহার কোন কায নাই বলিলেও চলে; সেই সামান্য কায,—একটা ছেলের খাওয়ার সামান্য উদ্যোগ—তাহা করিতে আর কতক্ষণ সময় লাগিবে? কিন্তু তিনি পুত্রের প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল উঠিয়া, ভোজন পাত্রে একটি সুবৃহৎ আম্র প্রদান করিয়া কহিলেন,—"এই আমটা খেয়ে দেখিস্, এটা আমাদের গোশালার গাছের নেংড়া আম।"

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি কি ক'রে চিন্তে

পার, কোনটা বোম্বাই আম, কোনটা নেংড়া আম, কোনটা গোপাল ভোগ?"

মাতা কহিলেন,—"চেহারা দেখলেই চিনতে পারা যায়। তুইও একটু চেষ্টা করলে, চিনতে পারবি।"

এইরূপে মাতাপুত্রের কথোপকথন আরম্ভ হইল। তাহার পর অনেক কথা হইল। পুত্রের পরীক্ষার ফল খুব ভাল হইয়াছে শুনিয়া মাতা হর্ষ প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণকিশোর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতে পারে নাই শুনিয়া মাতা নিশ্চিন্ত হইলেন। আপন মেসের বাটীতে তালাবন্ধ থাকায় কয়েক দিবস অন্য মেসে থাকিতে হইয়াছিল শুনিয়া, মাতা পুত্রকে স্বাস্থ্যের জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। এইরূপ অনেক কথা হইল; কিন্তু কৃষ্ণকিশোর ইঞ্জিনিয়র বাবুর পরমা সুন্দরী কন্যার কথা উত্থাপন করিবার অবকাশ পাইল না। মাতাও বাটী ভাড়ার কথা বা তাহার বিবাহের কথা তাহাকে বলিলেন না।

পূর্ব্বে যে কথাটা কৃষ্ণকিশোর মোটেই বুঝিতে পারে নাই, মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সে কথাটা সে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে গাড়ীতে বসিয়া, এবং বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বেশপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল সে অবিলম্বে বিবাহের কথাটা মাতার নিকট উত্থাপিত করিবে, এবং তাহার অনুমতি লইয়া পরদিনই কলিকাতায় যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে মাতার সম্মুখীন হইয়া বেশ বুঝিতে পারিল উহা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। সে বুঝিল, একটি

বিংশতি বর্ষবয়স্ক বালকের পক্ষে, ভক্তিময়ী মাতার নিকট, আপন মুখে আপনার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা অত্যন্ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ও লজ্জাকর কথা। ছি! ছি! সে মাতা: মাতার নিকট কিরূপে বলিবে যে, অমুক রূপবতী কিশোরীকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে, অতএব, তাঁহার অনুমতি লইয়া, সে তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিবে! এই অদ্ভুত ও দুরূহ কার্য করিবার সাহস সে তাহার হৃদয় মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

মাতাও তাহাকে এ কার্য করিবার অবসর প্রদান করিলেন না। তিনি প্রায় একঘণ্টাকাল পুত্রের সহিত নানা কথায় অতিবাহিত করিয়া শেষে বলিলেন,—"এই বার তুই শুতে যা। আর দেরী করিসনে; অনেক রাত হ'য়ে গেছে। কাল সকালে অনেক কাজ আছে; সকাল সকাল উঠিস্।"

কৃষ্ণকিশোর সাগ্রহে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কাজ, মা?"

মাতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"সে কালকের কাজ কালকে বলবো এখন। এখন তুই আর দেরী করিস্নে; শুতে যা।"

কৃষ্ণকিশোর ভাবিতে ভাবিতে আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহে অনিচ্ছা।

পরদিন সকালে গাত্রোত্থান করিয়াই কুমারবিহারী মাতার নিকট বজ্রাঘাতের ন্যায় কঠিন ও নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ করিল।

মাতা বলিলেন,—"আগামী ১৩ই আষাঢ় তোর বিবাহ হবে। তার আর বেশী দিন দেরী নেই; [illegible] সব উদ্যোগ করতে হবে; তুই আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দে।"

বিয়ে? কাহার সহিত বিয়ে? মাতা হঠাৎ [illegible] কুলশীলা কদাকারার সহিত তাহার বিবাহ [illegible]? কোন্ প্রেমহীনা লজ্জাহীনা আসিয়া তাহার প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবে? ইন্দ্রিয়ের বাবুর প্রণয়িনী [illegible] কাহাকে বিবাহ করিবে? অসম্ভব, অসম্ভব! সে যে তাহাকে এক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে! সে যে তাহারই প্রেমের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বাড়ী আসিয়াছে! সে যে গতরাত্রেও তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিয়াছে। সে যে সুন্দরী—অপূর্ব্ব সুন্দরী! সে যে তাহার হৃদয়-সরোবরের সরোজিনী!—তাহাকে ভুলিয়া—সেই হৃদয়ানন্দদায়িনীকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, সে আর কাহাকে—কোন প্রেমহীনাকে, কোন পাপিষ্ঠাকে তাহার হৃদয়ে স্থান দিবে? সে কাতর কণ্ঠে কহিল,—"মা, মা, তুমি —

মাতার নয়ন প্রান্তে পুত্রের অলক্ষ্যে একটু কৌতুক ক্রীড়া করিয়া গেল, অধর প্রান্তে সামান্য একটু হাসি, প্রথম দৃষ্ট সন্ধ্যা-তারার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"এখন, মা, মা, ক'রে আমাকে পাগল করিস্‌নে কেষ্ট! তুই কাগজ আর একটা পেন্সিল নিয়ে এসে এই আমার কাছে ব'স। বসে, কি, কি, জিনিষ কিন্‌তে হ'বে, কাকে কাকে নেমতন্ন করতে হ'বে, আমার কাছে জেনে, ফর্দ্দ করে নে।"

কৃষ্ণকিশোর পূর্ব্ববৎ কাতর কণ্ঠে কহিল,—"তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, মা; এখন আমার বিয়ে করা চলবে না।"

মাতা বিস্ময় দেখাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কেন চল্‌বে না?"

কৃষ্ণকিশোর শিরঃ কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিল,—"চল্‌বে না কেন, শুনবে? এই—এই ধর, তুমি যে এই বিয়েতে লোক জন সব নেমতন্ন করে আনবে, তারা এসে এই ছোট বাড়ীতে দাঁড়াবে কোথায়? দাঁড়াও, আগে আমি বড় হই; বড় বাড়ী তৈরী করি; তারি পর আমার বিয়ে হ'বে।"

এই অকিঞ্চিৎকর আপত্তি যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল। মাতা হাসিয়া কহিলেন,—"সে ভাবনা তোর ভাবতে হ'বে না। তার ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে রেখেছি। আমাদের বড় বাড়ী আমি তোর কাকাবাবুর কাছ থেকে কিনেছি। ঐ বাড়ীতেই বিয়ে হ'বে।"

কৃষ্ণকিশোর বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন কিন্‌লে?"

মাতা উত্তর করিলেন,—"কাল কিনেছি।"

কৃষ্ণকিশোর আপনার অপরিপক্ক বুদ্ধি লইয়া মনে করিল, যে বাটীর ক্রয় প্রসঙ্গে নানা প্রকার প্রশ্ন তুলিয়া সে বিবাহের কথাটা মাতাকে ভুলাইয়া দিবে। অতএব সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ করিয়া দিল,—"কাকাবাবু বাড়ীটা বিক্রি করলেন কেন?" মাতা বাটী বিক্রয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিলে, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকাবাবুর কত টাকা দেনা হয়েছে?" মাতা দেবরের ঋণের পরিমাণ অনুমান করিতে অক্ষম হইলে, সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কত টাকায় বাড়ীটি কিনলে?" মাতা এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিলে, সে নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিল,—"এই বাড়ী বিক্রয় টাকাতেই কি কাকাবাবুর সব দেনা শোধ যাবে?" মাতা তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিলে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কাকাবাবুরা আমাদিকে ও বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় থাক্‌বেন?"

মাতা ছোটবাবু মহাশয়ের নূতন বাটীর কথা উল্লেখ করিলেন; কিন্তু এবার তিনি পুত্রকে আর নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অবসর প্রদান করিলেন না। তিনি পুত্রের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আর কথায় কথায় সময় নষ্ট করিস্‌নে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয়, আমি ফর্দ্দগুলো তোকে লিখিয়ে দিই।"

কৃষ্ণকিশোর আবার বিপদাপন্ন হইয়া তাহার চির প্রসন্ন ললাট তরঙ্গায়িত করিল।

পুত্রের ঐ কুঞ্চিত ললাটতলে কি চিন্তা লীলা করিতেছিল,

স্থিরবুদ্ধিশালিনী জননী তাহা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন। তাহা অনুমান করিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু তিনি সহসা পুত্রের দুর্ভাবনা দূর করিলেন। আজ তিনি একটা সঙ্কল্প লইয়া পুত্রের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে পুত্রের মাতৃভক্তিটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে যে যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দেশের শিক্ষিত ভদ্রগণের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহার নিকট মাতৃভক্তি বড়, না রূপের মোহ বড়। দেখিবেন, যে মাতা তিলায় আপনার বক্ষের শোণিত দান করিয়া—স্বর্গাদপি গরীয়সী স্নেহধারা দিয়া—যে অসহায় শিশুকে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই শিশু বড় হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া সেই মাতাকে আপনার হৃদয়ের অনবদ্য ভক্তি দান করিবে, না, এক অজানিতা তরুণীর দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, আপনার মাতৃভক্তিহীন হেয় হৃদয় বাহ্যিক রূপের পদতলে লুটাইয়া দিবে? মনোমধ্যে এই সংকল্প স্থির করিয়া তিনি চিন্তান্বিত পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবছিস্ বেটা? বিয়ে করবি, এতে আর ভাবনা কি?"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"ভাবছিলাম কি জান, মা? এত তাড়াতাড়ি করে, এই আষাঢ় মাসে বিয়েটা না হ'লেই ভাল হ'ত।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? পাঁজিতে ত লেখা আছে যে, এই ১৩ই আষাঢ় তারিখে, বিয়ের একটা খুব শুভদিন।"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন, মা? এ বছরে ত আরও অনেক শুভদিন আছে।"

মাতা কহিলেন,—"তাদের মেয়ে বড় হয়েছে, এজন্যে তাঁরা তাড়াতাড়ি করেছেন। তা ছাড়া, বোধ হয়……"

কৃষ্ণকিশোর মাতার বাক্যে বাধা দিয়া কহিল,—"তা তাঁদের যদি এত তাড়াতাড়ি থাকে, তাঁরা মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় দিন না কেন? আমি ছাড়া ত এই বাঙ্গালা দেশে আরও অনেক সুপাত্র আছে।"

মাতা কহিলেন,—"কিন্তু সেই মেয়েটিকে আমি খুব পছন্দ করেছিলাম।"

কৃষ্ণকিশোর কহিল,—"চার মাস পরে, বিয়ে করবার জন্যে এই পৃথিবীতে আরও অনেক পছন্দসই মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে। আর ততদিনে, আমরা এ বাড়ীটা একটু মেরামত ক'রে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারবো। তাহলে যাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আসবেন, তাঁদের থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না।"

মাতা পুত্রের এই আপত্তিও খণ্ডন করিলেন,—"মেরামত না করলেও, এখন ও-বাড়ীতে বাস করলে, কারও অসুবিধা হ'বে না। রাধাকিশোরের বিয়ের আগে তোর কাকাবাবুও বাড়ীটা বেশ ভাল করেই মেরামত ক'রেছিলেন; রং পোচড়া আগাগোড়া নূতন করে দেওয়া হয়েছিল। এখন একটু ধুয়ে মুছে নিতে পারলেই বাড়ীটা ঠিক নূতন বাড়ীর মত হ'বে। তা' সে দশ বার দিনের মধ্যেই হ'য়ে যাবে।"

কৃষ্ণকিশোর আবার মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া নূতন আপত্তি উত্থাপন করিল,—"মা, এই গরমের দিনে যদি ভোজ খেয়ে লোকের অসুখ করে?"

পুত্রের এই বালকোচিত আপত্তির কথা শুনিয়া মাতা হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন,—"সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। ততদিনে বর্ষা আরম্ভ হ'য়ে যাবে, গরম থাকবে না। তা' ছাড়া ভোজের জিনিষের ফর্দ্দ করার সময়, আমি তা'তে ক্লোরোডিন, যোয়ানের জল,—এই সব ওষুধের নামও লিখিয়ে দেব এখন।"

কৃষ্ণকিশোর আরও মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়াও আর কোনও আপত্তি খুঁজিয়া পাইল না। তখন অগত্যা সে বাধ্য হইয়া বলিয়া ফেলিল,—"কিন্তু মা, আমি যদি বলি, যে আমি ও মেয়েকে বিয়ে করবোনা?"

মাতা আপনমুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্ণতা মাখিয়া এবং কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"তা' তুই বলতে পারিস্। এখন তুই বড় হ'য়েছিস্, লেখাপড়া শিখেছিস, এখন তুই আমার অবাধ্য হ'তে পারিস। আমি কিন্তু অবাধ্য ছেলের বাটীতে আর বাস করবো না। আমি কালই গুরু-ঠাকুরকে চিঠি লিখে কাশী যাবার ব্যবস্থা করবো।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

মাতার শেষ বাক্য গুলি শুনিয়া, তাঁহার স্নেহপ্রসন্ন মুখে বিষণ্ণতার কালিমা দেখিয়া এবং স্নেহময়ী মাতার প্রতি আপন বাক্যের ঔদ্ধত্য বুঝিয়া কৃষ্ণকিশোরের হৃদয় যেন এতটুকু হইয়া গেল। একটা বেদনার চাপে তাহার নবীন হৃদয়ের প্রেমাঙ্কুর যেন নিষ্পেষিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার রূপজ মোহের কুহক কাটিয়া গেল। মোক্ষদার কথা চিন্তা করিয়া সে মনে মনে বলিল, কে সে? সে যে তাহার জন্য আপনার জননীকে, আপনার চিরদিনের দেবতাকে, এই দেবাধিক পূজ্যাকে, এই পূজনীয়ারও পূজনীয়াকে গৃহত্যাগিনী করিবে? প্রেম পবিত্র, কিন্তু মাতৃস্নেহ যে স্বর্গের চেয়েও পবিত্র; প্রেমে কামনার আবিলতা আছে, কিন্তু মাতৃস্নেহ স্বর্গালোকের ন্যায় অনাবিল এবং তাহাতে প্রভাত কুসুমের সৌরভের ন্যায় নির্ম্মল সৌরভ পূর্ণ। এমন মাতৃস্নেহ, কামনাময় কামিনীপ্রেমের জন্য সে কি ত্যাগ করিবে?

কৃষ্ণকিশোর কোন ঐতিহাসিক পাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল যে, ম্যাকিডন্ প্রদেশীয় জগজ্জয়ী মহাবীর সেকেন্দার যখন পূর্ব্বদেশে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন স্বদেশীয় রাজ্যশাসন ভার, বন্ধু এণ্টিপেটারের হস্তে, ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু

সেকেন্দারের গর্ভধারিণী রাজধানীতে থাকিয়া, রাজ প্রতিনিধি এণ্টিপেটরের প্রত্যেক রাজকার্য্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজমাতার অযথ বাধায় এণ্টিপেটার অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি সেকেন্দারকে পত্র লিখিয়া সকল কথা জানাইলেন। সেকেন্দার বন্ধু ও রাজপ্রতিনিধি এণ্টিপেটারের সেই পত্র পাইয়া পত্রবাহক সেনানীকে কহিয়াছিলেন, "হায়! বন্ধু এণ্টিপেটার ত বুঝবে না যে, তার এরকম হাজার হাজার পত্র আমার মার এক ফোঁটা চোখের জলে ভাসিয়া যাইবে।" আজ কৃষ্ণকিশোরের স্মরণ পথে হঠাৎ সেই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির কথা উদিত হইল। তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির বন্যা বহিল। সেই বন্যার উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় হইতে সেই জ্যোৎস্নাময়ীর কমনীয়া মূর্ত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। সে মাতৃপদতলে মস্তক অবনত করিয়া কহিল,—"না, মা, তুমি আমার উপর রাগ ক'রো না। আমি তোমাকে ভারি অন্যায় কথা বলেছি। আমি চিরকাল তোমারই কথা শুনে এসেছি; আজও তোমার অবাধ্য হ'ব না। তুমি যেখানে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছ, সেইখানেই আমি ঐ ১৩ই আষাঢ়ই বিয়ে করতে যাব। দাঁড়াও, আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসি; কি কি উদ্যোগ কর্ত্তে হ'বে তোমার কাছ থেকে লিখে নেব।"

স্নেহরসে মাতার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "দাঁড়াও, বৎস, তুমি যদি মাতৃভক্তি দিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিতে পার, আমিও রক্ষাকবচের মত মাতৃস্নেহ দিয়া

তোমাকে ঘিরিয়া রাখিতে পারি, তোমার অভিলষিত সামগ্রী তোমাকে দান করিয়া, তোমার সংসার আলোকিত করিতে পারি।"

তিনি পুত্রের মস্তকে আশীর্ব্বাদপূর্ণ হস্ত প্রদান করিয়া, আপন ম্লান মুখ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—"ওঠ্, ওঠ্, আর পায়ে হাত দিয়ে থাকিস্‌নে। শীগ্‌গির কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয়। আমার রান্নাবান্না করবার সময় হ'য়ে এল।"

কাগজ পেন্সিল আনিবার জন্য কৃষ্ণকিশোর মাতার আশীর্ব্বাদ সংযুক্ত মস্তক উন্নত করিয়া ছুটিয়া আপন কক্ষে গেল, এবং উহা সংগ্রহ করিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইল।

মহারাজা যযাতি যেমন দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার নারীপ্রাণরক্ষা পুণ্যের ফল স্বরূপ সেই সুন্দরী শুক্রকন্যাকে হাতে হাতে লাভ করিয়াছিলেন, সূর্য্যবংশীয় মহারাজা দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমাস্থিতা নন্দিনী নাম্নী কামধেনুর পূজা করিয়া যেমন অভীষ্ট ফল সদ্য লাভ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন যেমন দেবাধিদেব পশুপতির পূজা করিয়া আশু পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ কৃষ্ণকিশোর মাতাকে প্রসন্ন করিয়া মাতৃভক্তি নামক মহাপুণ্যের ফলে, অভীষ্ট মোক্ষদা ফল হাতে হাতে লাভ করিল। কৃষ্ণকিশোর কাগজ লইয়া মাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া লিখিতে উদ্যত হইলে মাতা কহিলেন,—"লেখ্, শ্রীমান কৃষ্ণকিশোরের সিংহের সহিত, কলিকাতা মৃজাপুর ৭৮ নম্বর—"

মহাবিস্ময়ে কৃষ্ণকিশোর চমকাইয়া উঠিল; তাহার লিখনরত হস্ত গতিহীন হইয়া গেল।

মাতা কহিলেন,—"থামলি কেন? দেখ্, ৭৮নম্বর ···ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর শুভবিবাহের ফর্দ্দ।"

কৃষ্ণকিশোরের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তড়িৎ বেগে যেন তাহার দেহ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, মাতা কিরূপে তাহার মনের অতি গোপন অভিলাষের সংবাদ পাইলেন; কিরূপে তাহার দুই তিন দিন মাত্র অনুপস্থিতির মধ্যে তাহার মনোনীতা সুন্দরীর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ সকল তথ্য সে বুঝিতে চেষ্টাও করিল না;—স্তন্যপায়ী শিশু কি বুঝিতে চেষ্টা করে, কোথা হইতে সেই সুমিষ্ট পীযূষধারার সৃষ্টি হয়? মাতার স্নেহধারা উপভোগ করিয়া কৃষ্ণকিশোরও তাহার উৎপত্তির কারণ জানিতে চাহিল না। সে কেবল অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—"মা, মা—

মাতা হাসিয়া কহিলেন,—"আবার কি হল? আবার মা, মা, করিস্ কেন?"

কৃষ্ণকিশোর মাতার চরণদ্বয়ের উপর আপন অবনত মস্তক ন্যস্ত করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিল,—"মা, মা!"

* * * *

যথাকালে কৃষ্ণকিশোরের সহিত মোক্ষদার বিবাহ হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

দুই বৎসর পরে কৃষ্ণকিশোর ইংরাজি সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিল। আরও এক বৎসর পরে বি, এল্, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া যখন সে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া জমীদারীর ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিল, তখন তাহার জমীদারী ও গোশালার বার্ষিক আয় প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল। তথাপি সে আদালতের কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য এবং আরও অর্থাগমের জন্য বাটী হইতে প্রত্যহ জেলার সহরে আনাগোনা করিয়া ওকালতী কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল।

এই সময় কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে, নবীন গৃহস্থ দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য গুরুদেব কাশীধাম হইতে তাজপুরে আসিলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন,—"আমার কৃষ্ণকিশোর মানুষ হয়েছে, রোজগার কর্ত্তে শিখেছে, নিজের সম্পত্তি নিজে রক্ষা করতে শিখেছে, তার বিয়ে দিয়েছি। এখন সংসারে আমার আর কোনও কায নেই। এখন আপনি অনুমতি করুন, আমি মস্তকমুণ্ডন করে কাশীবাস করবো।"

গুরুদেব কৃষ্ণকিশোর ও মোক্ষদার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"মা, তোমার সংসারের কায শেষ হয়নি। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তার কায ফুরায় না। এখন দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাই তোমার কায; তার জন্তে কাশী বা অন্ত তীর্থ স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হয় না। তা ছাড়া পুত্রকে ছেড়ে অন্যত্র থাকবার অধিকার তোমার নেই। ' আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন,—

"পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।"

অর্থাৎ স্ত্রীগণ কখনও পিতা, স্বামী বা পুত্রের সহিত আলাদা হয়ে বাস করেন না। আজকালকার সুশিক্ষিতা স্ত্রীরা আপনার স্বদেশের মহাজ্ঞানী পিতৃগণকে দুষ্ট লোক মনে করেন; তাঁরা বলেন যে তাঁদের জব্দ করবার জন্তেই পুরান' ঋষিরা দুষ্টামী করে ঐ রকম অনুশাসন বাক্য প্রচারিত করেছিলেন। তুমি যেন, মা, তা' মনে ক'রো না। সুখ ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে, দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করে' যারা লোকহিতৈষণায় জীবন বিসর্জ্জন করে গেছেন, তারা দুষ্টামী জানতেন না। তাঁরা নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা নারী-গণকে ডাকাতের হাতে সমর্পণ না করে', পূজনীয় স্নেহময় পিতার হস্তে, প্রেমময় পতির পবিত্র হস্তে, নয়নানন্দদায়ক নন্দনের ভক্তিময় হস্তে অর্পণ করে গেছেন;—দুর্ব্বলাগণকে নিরা-শ্রয়া অসহায়া না করে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে ঋষিদের দুষ্ট লোক বলা যায় না। মা, সেই ঋষিদের ব্যবস্থায়

চল্লে তোমার ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হবে। তাই তোমার একাকিনী কাশীবাস করা চলবে না; ছেলের সংসারে ছেলের আশ্রয়েই থাকতে হ'বে। আর, মস্তকমুণ্ডনের কথা বলছ? চাণক্যের উপদেশটা সকলেই ত জানে, মা।—

"জ্ঞানেন মুক্তির্ন তু মুণ্ডনেন"

অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, মুণ্ডনের দ্বারা হয় না।"

সুতরাং কর্ত্রীঠাকুরাণীর কাশীবাস বা মস্তকমুণ্ডন কিছুই হইল না।—"আজ্ঞা গুরূনাং হ্যবিচারণীয়া'—গুরুগণের আজ্ঞা বিচার না করিয়াই পালন করা উচিত। তিনি গিন্নী মা ঠাকুরুণ' এই মান্য উপাধি গ্রহণ করিয়া বাটীতেই থাকিয়া গেলেন।

* * *

কৃষ্ণকিশোরের মাতার কাশীবাস না ঘটিলেও, ইঞ্জিনিয়ার বাবু কিন্তু কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তাজপুরের জমীদার কুলে কন্যার বিবাহ হইলেও, তাঁহার পত্নী শান্তিময়ী একটুও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তিনি কন্যার বস্ত্রালঙ্কার, জামাতার জন্য প্রেরিত উপঢৌকন, স্বামীর ব্যবহার কিছুই পছন্দ করিতে পারেন নাই। অহরহ অতৃপ্তিতে জীবন যাপন করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। রোগ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সকল প্রকার চিকিৎসাই ব্যর্থ হইল; অথবা চিকিৎসা তাঁহার পছন্দ মত না হওয়াতে চিকিৎসকগণের চেষ্টা তিনি নিজেই ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

কন্যার বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরেই তিনি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন।—তাঁহার অশান্তির অবসান হইল কি? আহা! বিধাতা পরলোকে তাঁহার অশান্তি অপনয়ন করুন; মৃত্যুর পর, তাহার শান্তিময়ী নাম সার্থক করুন; পত্নীর মৃত্যুর পর, কলিকাতার বাটী জমাতাকে দান করিয়া, পেন্সন লইয়া ইঞ্জিনিয়র বাবু কাশী যাইয়া বাস করিলেন।

দুই এক বৎসর বাদে, মোক্ষদা স্বামী ও শ্বশ্রূর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পিতাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভক্তিময় সদানন্দ জীবন দেখিয়া সে আর তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করে নাই।

* * *

শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া যায়; তোমারও নিষ্কৃতি লাভ কর।

এই ধরণীতলে পাওনাদারগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, এবং কৃষ্ণকিশোরকে এক একটি মহল বিক্রয় করায় তাঁহার জমীদারীর আয় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হওয়ায়, শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় পৃথিবীটাকে আর বসবাসের উপযুক্ত স্থান মনে করিলেন না; হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সাধ্বী সেবাব্রতা পত্নী পতিবিরহ সহ্য করিতে না

পারিয়া, বুঝি পরলোকেও নীরবে তাঁহার পদসেবা করিবার জন্য দিবসত্রয় মধ্যে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

মাতাপিতৃহীন রাধাকিশোরের প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার সহায় সম্পত্তি সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে; দেখিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ মুর্ত্তিমান কলহের ন্যায় তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; দেখিল, তাহার প্রেমময়ী পত্নী পুত্রকন্যাগণে পরিবৃতা হইয়া, ষষ্ঠীমাতার জীবন্ত প্রতিকৃতির ন্যায়, অনন্ত অভাবের হস্ত বিস্তৃত করিয়া অহরহঃ পূজা প্রার্থনা করিতেছে—

ধনং দেহি, বস্ত্রং দেহি, খাদ্যং দেহি,
দেহি রত্নালঙ্কারং।

সমাপ্ত